প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ — বৈশাখ, ১৩৬৯

মুদ্রাকর :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

শিশুর জ্ঞান হবার পর থেকেই সে করে কল্পনা। কল্পনার সঙ্গেই সে যুদ্ধ করে বাঘ, ভালুক প্রভৃতি কল্পিত শত্রুর সঙ্গে। ভূত-প্রেতও তা থেকে বাদ পড়ে না।

রূপকথা থেকে সে যোগাড় করে তার কল্পনার উপাদান। পক্ষিরাজে চড়ে সে যায় রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কখনও বনের বাঘ ভালুকের ওপর দিয়ে উড়ে যায়, কখনও বা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

তাই রূপকথার মধ্যে বাঘ, ভালুক, সাপের অন্ত নেই।

বীরত্ব বা শিভালরি বা হিরোয়িজমের ওপর মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে তার জন্ম হয় বোধহয় এখান থেকেই। তার যৌবনে শিশু বাঘ-ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়।

লালগোলার মহারাজা শ্রদ্ধেয় শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় কলমও যেমন ধরতে পারেন তেমনি ধরতে পারেন বন্দুক আর রিভলভার। কারণ তিনি একজন পাকা শিকারী।

বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য বনের মধ্যে তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখেছেন এই পুস্তকে। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা রূপকথার চেয়েও কম আকর্ষণীয় হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তাই এই বইখানি পুজোর সময় তুলে দিলাম বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েদের হাতে, যাতে সত্যিকারের রূপকথা পড়ে তারা আনন্দই পায়।

ইতি—

প্রকাশক

চিত্রসূচী

তিন রঙ ছবি

এক রঙ ছবি

———

সূচীপত্র

বিরাটকায় ভালুক বাচ্চাটাকে উঠাতে গলা টিপে ধরে

পৃঃ ১১০

রায়ডাকে বাঘের ডাক

অর্জুন সেনকে তোমরা নিশ্চয়ই চেন না? কী করেই বা চিনবে। আমার সঙ্গে সে কখনো কখনো শিকারে গিয়েছে বটে, কিন্তু একটি দিনও বন্দুক ধরেনি। তবে মাঝে মাঝে তার দু'চারটে উপদেশ এমন লাগসই হত যে আমারই অবাক হবার পালা। তবু কেন যে সে কারো কাছে ধরা দিতে চাইতো না, তার রহস্যটা এখনো খুঁজে পাইনি।

পাক্কা ছ' ফুট লম্বা দোহারা গড়ন, ঘন-কুঞ্চিত কেশে ব্যাক্-ব্রাশ—খাকী পোশাকে তার জাঁদরেল চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। লম্বা নাক, বড় বড় চোখ দুটিতে অস্বাভাবিক দীপ্তি। চিবুকের ভাঁজে এমন একটা চাবুকের মত রেখা, দেখলেই মনে হয়, তার সব কিছুতেই 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব। চাপা ঠোঁটের আড়ালে এমন একটা চাপা হাসি লুকিয়ে থাকতো, যার অর্থ, প্রয়োজন হলে সে যেন সব কিছুই একটিমাত্র ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে। যুদ্ধফেরত কিনা—আবিসিনিয়ার

... তবে সৌভাগ্যের কথা, তার মিলিটারী মেজাজের
এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সহজে কথা বলতে সে নারাজ—কিন্তু একদিন কবি-বন্ধু অবনীকান্তের খোঁচায় মনের কোন্ এক সূক্ষ্ম তারে ঘা পড়তেই অর্জুন সেন একটার পর একটা তার শিকার অভিজ্ঞতা বলতে থাকে। তার দ্বিতীয় গল্পটাই আজ তোমরা শোনো।

সেদিন বর্ষার সন্ধ্যা। প্রথম কিস্তি চা দিতে চাকরটা এত দেরি করে কেন, খোঁজ নিতে বাইরে এসেই দেখি বন্ধু অর্জুন সেন জলে ভিজতে ভিজতে সিঁড়ি দিয়ে খটমট করে উঠে আসছে। দু'হাত তুলে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলি, আরে এসো ভাই সব্যসাচী, এসো। এমন দিনে যে তোমাকে কাছে পাব তা ভাবতেও পারিনি। এসো, বর্ষায় আসর জমিয়ে বসা যাক।

কবি-বন্ধু অবনী কল্পনায় যেমন সিদ্ধহস্ত, খাদ্য-পরিকল্পনাতেও তাঁর জুড়ি নেই। তিনি তখনি কাব্য-প্রতিভার একটি ঘিয়ে-ভাজা নমুনা ছুঁড়ে দিলেন—

এমন ঘন ঘোর বরিষায়—
এমন দিনে তোরে বলা যায়—
পরান চা-চা করে 'সসারে' ঝরঝরে
বসে যে আছি তারি ভরসায়।

—অতএব বেয়ারা ডাকো—অন্দরে খবর পাঠাও—আনুষঙ্গিক মালগুলো না আসা পর্যন্ত স্থিরো ভব—তারপর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শ্রীল শ্রীযুক্ত অর্জুন সেনের সিনা-ফুলিয়ে-গল্প-বলার স্রোতে ভেসে যাও—কী বল হে?

অবনীর উচ্ছ্বাসে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু অর্জুনের মুখের ভাবটা হঠাৎ থমথমে হয়ে উঠতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—তাকে থামিয়ে দেওয়া দরকার। বলা যায় না, মিলিটারী মেজাজ কখন বিগড়ে ওঠে। 'কবিরা নিরঙ্কুশ'—এ পাঠশালার ছাত্র সে তো নয়। তাই অবনীকে চোখ টিপে বলি—হয়েছে, হয়েছে, তোমার কবিত্ব এখন মুলতুবী থাক—চা কচুরির ফরমাশ আগেই দিয়ে রেখেছি। আজ নাকি মাছের কচুরি হবে—তাই কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। অতএব আমি প্রস্তাব করি, ততক্ষণ অর্জুন তার গল্প আরম্ভ করে দিক।

সেদিনকার মজলিসে পোস্টমাস্টার মশাই উপস্থিত ছিলেন। একটা জরুরী কাজ নিয়ে তিনি এসেছিলেন, বৃষ্টি এসে পড়ায় তাঁর যাওয়া হয়নি। তিনিও এক কোণে একটি চেয়ারে চুপ করে ঝিমোচ্ছিলেন। আহা বেচারা! কতই না খাটতে হয়—কত দূরদূরান্তের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার খবর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার মালিক তিনি। তারপর কলমপেশা তো আছেই—তাই সন্ধ্যা লাগতেই তিনি ঢলতে শুরু করেন। হঠাৎ তিনিও যেন সজাগ হয়ে উঠলেন—সেই ভাল, গল্পটাই আরম্ভ হোক।

একটা ভ্রুভঙ্গী করে অর্জুন একবার সেদিকে চাইলে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম—কিছু মনে করার নেই—ইনি কৃষ্ণভক্ত জীব—নেহাত গোবেচারা। তবে যখন বাঘ শিকারের গল্প শুনতে এঁর উদগ্র বাসনা, চালিয়ে যাও না কেন?

অর্জুন সেন আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই বললে, আজকের কাহিনীটা তেমন বড় নয়—তবে বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে কিছু কম যায় না।

অবনী বললে, সেই ভাল, কারণ একটু পরেই তো চা-টা সব আসছে—সেটাও তো আরামসে গিলতে হবে!

অর্জুন বলে যায়—অনেক দিনের কথা বলছি। আমার যুদ্ধে যাওয়ার আগের ঘটনা।

সেবার কোশী নদীর উজান ধরেই তরাই অঞ্চলে আমাদের তাঁবু পড়েছে। সামনে ভয়াবহ অরণ্যপথ। একদিন একাই জঙ্গলে ঢুকে পথ হারিয়েছি। সন্ধ্যা আগতপ্রায়—আকাশেও পুঞ্জীভূত মেঘ। চিন্তায় ও পরিশ্রমে সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। হঠাৎ দেখি এক গাছতলায় একটি বৃদ্ধ গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই হাতছানি দিয়ে ডাকলে, আর কী বললে, জানো?

—বুঝেছি সাহেব, তুমি পথ হারিয়েছো। আমার সঙ্গে এসো—তোমার আস্তানায় পৌঁছে দি। কাঠ কাটতে এসেছিলাম—হাঁপটা বেড়েছে কি না, তাই আজ আর কিছুই হোল না!

তাঁবুতে পৌঁছে তাকে কিছু বকশিশ দিতেই সে হাতজোড় করে আপত্তি জানায়—আপনাকে পথ দেখিয়েছি, পয়সা নেব কেন?

বৃদ্ধের কথায় মুগ্ধ হলাম। কিছুতেই কোনো মতেই তাকে কিছু নেওয়াতে পারিনি। সেদিনের সেই কথা আজও আমার মনে দাগ কেটে বসে আছে।

পোস্টমাস্টার মশাই হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলে উঠলেন—এর মধ্যে বাঘের গল্প কই

অর্জুন সেন বাধা পেয়ে চট্ করে বলে ওঠে—ওঃ, তোমরা বুঝি ভূমিকা বাদ দিয়েই শুনতে চাও? তাহলে থাক এখানকার কথা। এবার সোজা বাঘের দেশেই যাওয়া যাক। শোনো—

কলকাতা থেকে আমরা জনাচারেক বন্ধু একদিন দার্জিলিং মেলে চেপে বসলাম। উদ্দেশ্য শিকার—কিন্তু দার্জিলিঙে নয়—ডুয়ার্সের এক চা-বাগানে আমার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে আমরা চলেছি। ডুয়ার্সের যেমন খ্যাতি, তেমনি অখ্যাতি। খ্যাতির কারণ, সেদিকে শিকার নাকি প্রচুর। আর অখ্যাতিটা খুবই মারাত্মক, কারণ একবার যদি ম্যালেরিয়া প্রভুর দয়া হয়, তাহলেই কালাজ্বর, তার ওপরেও ব্ল্যাক-ওয়াটার ফিভারের কথা আর বলে কাজ নেই।

কবি অবনীকান্তের প্রশস্তি-বচন—যা বলেছ ভাই,

ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়া, দুরু দুরু কাঁপে হিয়া,
ধনে প্রাণে মারা যায়, হায় হায়, হায় রে!

অর্জুন সেনের রোষকষায়িত দৃষ্টি। হাত তুলেই ধমক দিয়ে বলে—বাগড়া দিও না—শুনে যাও। পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করে সেই লালমনিরহাট, আবার গাড়ি বদলে ছোট লাইনে গড়িয়ে গড়িয়ে কোনওরকমে নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছুতেই দেখি বন্ধুবর তাঁর চা-বাগানের গাড়িটি নিয়ে সশরীরে হাজির। আদর-আপ্যায়ন কোনও কিছুরই ত্রুটি নেই। প্রথমতঃ বিশ্রাম, তারপর জলযোগান্তে কিছুটা এদিকওদিক ঘুরে ফিরে দেখে নেওয়া গেল।

শিকারের জায়গা একটা বেছে নেওয়া দরকার। বন্ধু বললেন, সে জন্যে চিন্তা নেই—এখান থেকে মাইল বারো দূরে একটা পাহাড়ী গাঁয়ে বাঘের খুবই অত্যাচার। অবশ্য বাঘ ঘুরে ফিরে আমাদের এদিকেও কৃপা করে দর্শন দিয়ে যান, কিন্তু বড় বেশী হামলা করেন না, এই যা রক্ষে!

—সে কি হে? এখানেও বাঘ আছে নাকি? তবে আর দূরে গিয়ে কী লাভ?

···জানতে পারা গেল বাঘটা উধাও হয়েছে। [পৃষ্ঠা ৬

একটি সহাস্য উত্তর পেলাম—যা বলেছ ভাই! তবে কি জানো? কবে কোন্ দিন ব্যাঘ্র মহারাজের কৃপা হবে, তিনি পাহাড় থেকে নেমে এদিকে শুভাগমন করবেন তার তো কিছুই ঠিক নেই—কাজেই ঠিক অকুস্থলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে জঙ্গলে যাওয়ার পথে ভালুকের দেখাও মিলবে—বুনো শুয়োরও আছে—বিস্তর হরিণও দেখতে পাবে, যদি চাও তো এন্তার পিটতে পারো।

শুনে পুলকিত হলাম। আর কথা কি? আমরা পরের দিন সকালেই

রওনা হয়ে পড়ি। বলাই বাহুল্য, সঙ্গে কয়েকটা টিফিন কেরিয়ারে প্রচুর খাবার, পানীয় জল, বন্দুক, টোটা ইত্যাদি সরঞ্জামের কোনই ত্রুটি নেই। আর সঙ্গে ছিল বন্ধুবরের অফিসের গাঁট্টাগোঁট্টা দারোয়ান খড়গ সিং—জাতে নেপালী। তারও শিকারীর বেশ—কথায় বেশ চটপটে—সব কাজেই চৌকস।

বেলা আটটা নাগাদ আমরা সেই গ্রামে এসে পৌঁছুতেই কয়েকজন গ্রামবাসী আমাদের মোটরকে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে একজন মাঝবয়সী লোকের হাতে একটা টাঙ্গি, কোমরে ভোজালি দেখে তাকেই ডেকে নিলাম। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে তাকে জিজ্ঞেস করি—বাঘ কোথাও মারি করেছে কিনা।

উত্তরে সে বললে—বাঘ একটা গরুর কোমর থেকে খানিকটা মাংস খেয়ে উধাও হয়েছে।

বুঝলাম এটা বাঘের কীর্তি নয়—নিশ্চয়ই বাঘিনী। কারণ বাঘ হলে সে গরুটার মাথার দিকে কিংবা ঘাড়ে আক্রমণ করতো।

গ্রামের কথাটা সংক্ষেপেই বলে রাখি। পাহাড়ী গ্রাম, ছোট ছোট কুঁড়েঘরের বস্তি সব। কেবল দূরে মিশনারিদের একটি গির্জা দেখা যায়—কাঠের তৈরী। আর একটু পশ্চিমেই গ্রামের একটি বিশিষ্ট মোড়লের বাড়ি। যেমন তেমন লোক নয়—হয়তো হাজার বিঘে জমির মালিক—চাষ বাস করা, খাজনাপত্র আদায় ইত্যাদি কাজে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকে। তবে ভঙ্গীতে চেহারায় বেশ বোঝা যায়, সে কারও পরোয়া করে না। ধানের মরাই কয়েকটা তার বাড়িতে। হাঁস, মুরগি, গোটাকয়েক ভেড়া ছাগল, কয়েক জোড়া বলদ, একপাল পাহাড়ী গরু, দু-দুটো গাধা, একটা খচ্চর—এই সব নিয়ে বিরাট তার সংসার। একপাশে আছে পিলখানা—গোটা আষ্টেক হাতি পায়ে শিকল বেঁধে মোটা মোটা শালকাঠের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। প্রত্যেকের সামনেই রাশীকৃত পুণ্ডীগাছ (কলাগাছের মত একজাতীয় সরু সরু গাছ—হাতির খাদ্য)। একটা ছোট বাচ্চা হাতিও দেখলাম। ঘন মেঘের মত তার গায়ের রং—ছোট্ট শুঁড় দুলিয়ে সে যখন কান দুটো নাড়তে লাগলো—মনে হল, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই দেখি।

কিন্তু সে সময় কই? মোড়লের সঙ্গে কথা বলে গোটা দুই হাতি চেয়ে নিতে হবে—তা ছাড়া আরও অনেক কিছু সাহায্যই সে করতে পারে।

খড়্গ সিংকে পাঠিয়ে খবর দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পরেই মোড়লের আহ্বানে আমরা তার কাছে হাজির হলাম। চেয়ার টেবিলের বালাই নেই। কাঠের খুঁটির ওপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে অনেকটা বেঞ্চের মত করা আছে। তারই ওপর বসা গেল।

আমাদের উদ্দেশ্য বলতেই মোড়লও উৎসাহী হয়ে তৎক্ষণাৎ আমাদের দু' দুটো হাতি দেবার কথা তার মাহুত-প্রধানকে বলে দিল এবং নিজেও সে একটা পৃথক হাতিতে আমাদের সঙ্গে যাবে, এই সংকল্প ঘোষণা করলে।

আমরা যদিও সকালের খাওয়াটা বেশ ভালভাবেই সেরে এসেছিলাম, কিন্তু মোড়লের নিমন্ত্রণকে এড়ানো গেল না। তবে উপকরণে আড়ম্বর ছিল না,—চিড়ে, কাঁচা দই, গুড় আর সঙ্গে গুটিকয়েক পাকা কলা।

আতিথ্যধর্মে বাধা দেওয়া চলে না ; কাজেই দই, চিড়ে, কলা আর গুড় দিয়ে অপূর্ব এক মণ্ড তৈরি করে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করা গেল। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল—এই বুঝি বমি হয়ে যায় আর কি! অভ্যেস নেই তো! কিন্তু চা-বাগানবাসী আমার সেই বন্ধুটি খুব তৃপ্তির সঙ্গে সেই কাঁচা ফলারের উৎসবে মেতে গেল।

অতঃপর যাত্রাপর্ব। একটি হাতির ওপরে আমার সেই বন্ধুবর, আমি আর খড়্গ সিং—আর একটা হাতিতে আমার সহগামী বন্ধু সুবীর, অনন্ত আর অতুল, পেছনে তৃতীয় হাতির ওপরে গাঁয়ের মোড়ল. তারও পেছনে জন বিশেক লোক, হাতে টাঙ্গি, বর্শা, লাঠি ইত্যাদি।

পাহাড়ী নদী রায়ডাক--কোন্ অজানার ডাকে ছুটে চলেছে, কে জানে!

অবনীকান্ত ঠোঁটে একটি আঙুল চাপা দিয়েই বসে ছিল, সে তড়াক্ করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেই আর এক নম্বর ভাবপ্রবণতা জাহির করে বসল—আহা, কী সুন্দর! যেন সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কোন্ নাম-না-জানার সন্ধানে, পর্বতে বনে বনান্তে ছুটে চলেছে!

অহেতুক বাধা পড়ায়, অর্জুন সেন এক ঝটকায় তাকে বসিয়ে দিয়েই আবার বলতে থাকে—নদীর জল গভীর নয়, কিন্তু তার স্রোতে বুঝি সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বুনো মোষগুলো যখন নদী পার হয়, তখন তাদেরও খুব সন্তর্পণে এক একটা

করে পা তুলে ফেলতে হয়—একটু অসাবধান হলেই স্রোতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। হাতির পিঠেই আমরা নদীর ধারে এসে থমকে দাঁড়ালাম। এখন কোন্ দিকে যাওয়া যাবে? এমন সময় সেই মোড়ল তার দলবল সঙ্গে সেখানে এসে আমাদের সেই নদীর ধার দিয়ে বরাবর পুব দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলে। প্রায় মাইলটাক সেই উঁচুনীচু জমির ওপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর সামনে একটা ধানের খেত পাওয়া গেল। সেটাকে ডাইনে রেখে আরও কিছুটা যেতেই কয়েকটা ঝোপ, তার ওপারেই কয়েকটা বস্তি। মোড়ল বললে—বাঘটা সেখানেই মারি করেছে। প্রায়ই কৃষকদের গরু ছাগল ধরে নিয়ে যায়। কয়েকদিন আগেও একটা লোক বাঘের হাতে ঘায়েল হয়েছে।

আমরা খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চলি। মোড়লের হাতিটা একটা জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতেই, কেমন যেন গুড়গুড় করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হাতিদুটোও থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পেছনে যারা, তারা সবাই মিলে এমন একটা হইচই শুরু করে দিলে যে মনে হল, সত্যি বুঝি বাঘ বেরিয়েছে।

কিন্তু, কোথায় বাঘ?

সামনে তাকিয়ে দেখি, গ্রামখানা ছাড়িয়েই তরাই অঞ্চলের ঘন অরণ্য আরম্ভ হয়েছে। বিরাট বিরাট শালগাছ মাথা উঁচু করে যেন আকাশ ছুঁতে চায়। নীচে জঙ্গল, তার মধ্যে নানারকম ফার্ন জাতীয় গাছ। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। যারা জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে যায় তারা, আর বন-বিভাগের কর্মচারীরা সকলেই ওই হাঁটাপথেই জঙ্গলে প্রবেশ করে। শোনা গেল, ওর মধ্যেই নাকি বাঘের আড্ডা। কিন্তু বিনা অনুমতিতে ওখানে যাওয়া যাবে না।

আপাততঃ যে বাঘটা গ্রামে অত্যাচার শুরু করেছে এবং আশপাশেই হয়তো কোথাও আছে তারই খোঁজ করা যাক। গ্রামবাসীদের দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করতে তারা সবাই একবাক্যে জানালে—বাঘটা আর কোথাও যায়নি, নিশ্চয়ই ঝোপে-ঝাড়ে কোথাও লুকিয়ে আছে।

একটা জঙ্গলের খানিকটা বাঁশের বন। সরু তলতা বাঁশের ঝোপ—কঞ্চিগুলো এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে যেন মাটিকে ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায়। তার পাশেই একটা বেতের

জঙ্গল। বাঘ যদি বেতবনে ঢুকে থাকে, তা হলেই তো মুশকিল। নাঃ, তা বোধ হয় নয়। তাদেরও তো সুবিধা-অসুবিধা আছে! এইরকম অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনাই করে চলি।

বাঘটা যেখানে মারি করেছে, তার পাশ দিয়েই ছোট্ট একটি ঝরনা তরতর করে বয়ে এসে রায়ডাক নদীতে পড়েছে। আমরা আশেপাশেই খোঁজাখুঁজি করি, বাঘ হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে—সন্ধ্যা হলেই আবার সে আহার-পর্বে যোগদান করবে।

এদিকে বেলাও প্রায় গড়িয়ে এসেছে—সূর্যদেব পাটে বসবেন এইবার। এর মধ্যেই যদি কিছু করা সম্ভব না হয়, তবে সমূহ বিপদ। মরিয়া হয়ে মোড়ল তখন হুকুম দিলে—জঙ্গলগুলো 'বীট' করা হোক!

তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল। জঙ্গলে বীট্ শুরু হতেই আমার হাতিটা হঠাৎ শুঁড় উঁচু করেই বিকট একটা আওয়াজ তুললে—সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য হাতিগুলোও তার সঙ্গে যোগ দেয়। বন্দুক হাতে নিয়ে আমি তৈরী হয়েই রইলাম। খড়গ সিং তার টাঙ্গিটা বাগিয়ে বসে রইল। কি জানি যদি বাঘটা লাফিয়ে হাতির ওপর আক্রমণ চালায়, তবে সেও টাঙ্গির সদ্ব্যবহার করতে এতটুকু'ও দেরি করবে না।

ঠিক সামনেই, বোধ হয় বিশ গজও হবে না, জঙ্গলের ফাঁকে হঠাৎ একটা বাঘের মুণ্ড জেগে উঠেই ডুবে গেল—তার ওপর একটা আক্রমণ আসন্ন বলেই বুঝি সে আত্মগোপন করতে চায়!

কিন্তু তা তো নয়! বাঘটা যেন সোজা বেরিয়েই ছুটে চলে, যেন ওই ঝরনাটা পার হয়ে, আমাদের কলা দেখিয়ে ওই অরণ্যে ঢুকে পড়বে। মুহূর্তের জন্যে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। বাঘ ঝরনাটা লাফিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করতেই আমার রাইফেলও গর্জন করে উঠল।

গুলিটা লাগলো বাঘের কোমরে—একটা বিরাট গর্জনে রায়ডাকের বনভূমি কেঁপে উঠল। বাঘটা ঘুরে দাঁড়িয়েই হাতিকে লক্ষ্য করে বিদ্যুতের মত ছুটে আসে—প্রকাণ্ড হাঁ—মুখের ভেতর সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠল—"হয় তুমি মর, নয় আমি মরি," এমনি একটা বেপরোয়া ভঙ্গী তার।

আর মুহূর্তকাল বিলম্ব নয়। আমার দ্বিতীয় গুলিটা তার মুখগহ্বর ভেদ করে বেরিয়ে গেল। হতভাগ্য জানোয়ারের অমিত বিক্রম তখন ধুলোয় গড়াগড়ি।

দ্বিতীয় গুলিটা বাঘটার মুখগহ্বর ভেদ করে বেরিয়ে গেল। [পৃষ্ঠা ৯

পরীক্ষা করে দেখলাম আমার অনুমানই ঠিক—বাঘ নয়, একটা বেশ বড় রকমের কেঁদো বাঘিনী!

গল্প শেষ করে অর্জুন একটা মোটা বার্মা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে অবনীকে বললে—কই হে কবিবর, তোমার কচুরি আর চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওগুলো তো অনেকক্ষণই টেবিলে তোমার রসনার অপেক্ষায় আছে।

চমকে উঠলাম।

সত্যিই তো—চা-টা যে একেবারেই ঠাণ্ডা—!

—ওরে কে আছিস, শিগগির গরম গরম আর এক কাপ চা নিয়ে আয়।

কবিবরের ভাবে ঢলঢল চোখে তখনও বাঘের ছবি—সেটা সেরে যেতেই সে চিৎকার করে উঠল—আরে, দেখেছো মজাটা—পোস্টমাস্টার মশাই দিব্যি গরম গরম চা কচুরি খেয়েই কখন সরে পড়েছেন!

অর্জুন সেনের টিপ্পনী—মাস্টার লোক কিনা তাই সর্ববিষয়েই মাস্টার!

ভালুকের সঙ্গে ভল্টুর লড়াই

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা পাস করে দিয়ে নূতন বদলি হওয়া অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার পরেশ বট্‌ব্যাল, যিনি সকলের কাছে ভট্‌ভ্যাল নামেই সুপরিচিত, তাঁর কোয়ার্টারে ফিরে এসেই দেখেন শনিবারের সান্ধ্য আসর জমজমাট। স্থানীয় হেড্‌মাস্টার গড়গড়ি মশাই সদ্য-কেনা বালাপোশখানা গায়ে জড়িয়ে ফরাশের ওপর এক কোণে জবুথবু হয়ে বসে আছেন; ভট্‌ভ্যাল ঘরে ঢুকতেই জিরাফের মত মাথাটা উঁচু করে বলে উঠলেন, "ল্যাঠা চুকলো? বাবা রে বাবা—এদের লাইনেরও শেষ নেই—গাড়িরও যাওয়া আসার বিরাম নেই—গোটা ভারতবর্ষটাকেই রেল লাইনে সাপের মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে—এমন সন্ধ্যেবেলাটাই মাটি হয়ে গেল।

মধ্যমণি সুরেন ভায়া কোনো কালে ফৌজদারী কোর্টের পেশকার ছিলেন, কী

কারণে তাঁর চাকরি যায় ; দুষ্ট লোকেরা যাই বলুক না কেন, আমাদের সে কথায় কাজ কী ? অধুনা স্বাধীন জীবনের প্রতি তাঁর দুর্দান্ত আকর্ষণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই কারণে অকারণে তিনি বীরদর্পে জানিয়ে থাকেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় !' সাধে কি আর অমন কাঁচা পয়সার চাকরিটা ছেড়ে এলাম হে ? আরে ছোঃ—হাকিমের হুমকি কি আর এ ধাতে সহ্য হয় ? পরের গোলামি করা পোষায় না।

পোস্টাফিসের তার-বাবু মদনমোহন খাড়া ছোকরা হলেও চশমা চোখে বেশ ভারিক্কী চাল দিতে ওস্তাদ। খাড়া মশাই খাড়া হয়ে চলতে অক্ষম, কারণ জন্ম থেকেই তাঁর বাম পদটি ইঞ্চিখানেক ছোট বলেই তিনি খুঁড়িয়ে চলেন। তাই আড্ডার কেউ কেউ তাঁকে বামপন্থী বলেই ডাকতেন। খাটের ওপর টরেটক্কা বাজিয়ে সাংকেতিক ভাষায় তিনি বললেন, "রহু ধৈর্যং, সময় আসিলে হবে আপনি সুদিন।"

এলোমেলো কথাবার্তায় সবাই মশগুল। ইতিমধ্যে পরেশ ভট্‌ভ্যাল অতিথিদের চায়ের পরশ দেবার জন্যে তাঁর গিন্নীকে বলতে গিয়েছিলেন ; ফিরে এসেই যেন ভূতাবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে যান—দরজার সামনে ওই লোকটি কে ?

সামলে নিতে এক আধ মিনিটের বেশী সময় লাগার কথা নয়। তবু ভট্‌ভ্যাল চিনি চিনি করেও যেন ঠিক চিনে উঠতে পাচ্ছেন না বুঝেই আগন্তুক বললে—অর্জুন সেন নামে কোনও বন্ধুকে মনে পড়ে ?

—আরে, এসো ভাই এসো—তোমায় কি ভুলবার জো আছে ? উঃ স্কুলে কি না দুষ্টুই ছিলে তুমি ! তোমার দৌরাত্ম্যে আমরা সবাই তটস্থ থাকতাম।

পরেশ ভট্‌ভ্যাল আনন্দে বিভোর হয়ে বন্ধুর হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে এনে প্রত্যেকের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দেন—আমার বিশিষ্ট বন্ধু, শ্রীঅর্জুন সেন, আমাদের স্কুলের পোলভল্ট চ্যাম্পিয়ান—হালে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে বড় অফিসার।

সুরেন ভায়ার চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আসুন, আসুন, কাপ্তেন সেন, আমাদের এই ক্ষুদ্র আসরে আপনার শুভাগমন হোক !

অর্জুন সেন সবাইকে একটি নমস্কারে আপ্যায়িত করে সামনের চেয়ারটায়

বসেই বললেন—পরেশ ভাই, আমি একা নই—আমার সঙ্গে আরও জনচারেক লোক আছে—মালপত্র নিয়ে তারা স্টেশনেই অপেক্ষা করছে।

পরেশের কণ্ঠেও অনুরাগের মূর্ছনা—তোমার লোকরা স্টেশনে বসে থাকবে কেন? তুমি বস, আমি ওদের ডেকে আনি। হ্যাঁ, ভাল কথা, ওদের কোনও একজনের নামটা বল দেখি, খুঁজে বার করা চাই তো!

—ভন্টুর নাম ধরে ডাকলেই সাড়া পাবে।

অর্জুন সেন মাথার টুপিটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে যেন একটু আরাম করে বসলেন। তাঁর ভাবভঙ্গীটা বেশ গম্ভীর, তার ওপর বাটারফ্লাই গোঁফজোড়াটা যেন সমস্ত কিছুকেই বিদ্রূপ করে চলতে চায়। এই হিটলারী গোঁফের দিকে তাকিয়ে হেডমাস্টার মশাই নাৎসীবাদের প্রশংসায় মেতে উঠবেন কিনা ভাবছিলেন, কিন্তু তারবাবুর টেলিগ্রাফিক সংকেতে তিনি সন্ত্রস্ত হয়েই একেবারে চুপ।

এদিকে ভট্‌ভ্যাল তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গিয়ে গোটা স্টেশনটাই চষে ফেললেন—এক জায়গায় জন-চারেক লোককে যেমন অবস্থায় দেখবেন বলে তাঁর আশা ছিল, সে রকম কিছুর সন্ধান না পেয়ে তিনি প্রায় হতাশ হয়েই ফিরে আসছিলেন; ঠিক এমনি সময় স্টেশন প্লাটফরমের শেষপ্রান্ত থেকে একটি বিরাটকায় পুরুষকে গটমট করে আসতে দেখেই তাঁকে দাঁড়াতে হোল।

কাছে আসতেই ভট্‌ভ্যাল একধারে সরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নাম কি ভান্টুবাবু?

আগন্তুক থমকে দাঁড়িয়েই বললেন—হ্যাঁ, আমারই নাম—কেন? কী দরকার?

—আপনার আর সব সঙ্গীরা কোথায়? আর তিনজন?

—তারা লেডিজ ওয়েটিংরুমের সামনে।

—কেন? তারা লেডিজ নাকি?

হিন্দী ভাঙ্গা বাংলায় ভন্টু চোখ ঘুরিয়ে বলতে থাকে—তা হবে কেন? জলজ্যান্ত পুরুষ—গোঁফদাড়ির জঙ্গল তাদের মুখে প্রচুর দেখতে পাবেন। ওদিকটায় নিরিবিলি কিনা, তাই ওখানেই রাত কাটাবার আয়োজন করছে। কিন্তু, এত কথায় কাজ কি? আপনি কে?

অ্যাসিস্ট্যান্ট কথাটি বাদ দিয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন—আমি এখানকার স্টেশন মাস্টার। আমার বন্ধু অর্জুন সেন আপনাদের ডেকে নিয়ে যেতে বলেছে, এখন আপনাদের মোটঘাট নিয়ে চলে আসুন দেখি। স্টেশনের আলো আর একটু পরেই নিবে যাবে।

ভণ্টু একটা ভণ্ট্ খেয়ে তার সঙ্গীদের কাছে ছুটে গেল এবং মিনিট দুয়ের মধ্যেই তারা চারজনে মালপত্র সমেত পরেশবাবুর পিছু ধরল। পথে কারো মুখে কোনও কথা নেই—কিন্তু স্টেশনের আলো নিবে যাবে কেন, এইটাই ভণ্টুকে চিন্তিত করে তুলেছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—স্টেশনের আলো নিবে যাবে কেন? আর বুঝি ট্রেন নেই?

—নাঃ, সেই শেষরাতে একখানা ব্যালাস্ট ট্রেন যাবে—মিছেমিছি এতটা রাত আলো জ্বেলে রেখে কেরোসিন পুড়িয়ে লাভ কী? আক্রাগণ্ডার দিনে আমরাই সেটা নিজেদের কাজে লাগাই বুঝলেন?

ভণ্টুর ভারী গলায় উত্তর—বুঝিয়েছি বই কি! খুব বুঝিয়েছি।

ভণ্টুর ইঙ্গিতে ভট্‌ভ্যাল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

কোয়ার্টারে এসে তাদের জন্য সবরকম বন্দোবস্ত করে দিতে বেশী সময় লাগলো না। হই-হল্লার মধ্যে আদর আপ্যায়ন শেষ হতেই তাঁরা নির্দিষ্ট ঘরে সমাসীন হলেন। আগন্তুকদের চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে ভট্‌ভ্যাল আসরে উদিত হয়ে দেখলেন অর্জুন সেন হাত পা নেড়ে তখন কী যেন বলছে, আর সবাই অবাক্ হয়ে শুনছেন।

ভট্‌ভ্যাল আসতেই তার পিঠে একটা থাবা মেরে অর্জুন সেন বললে—তুই বাহাদুর আছিস, ওদের বেশ লুফে এনেছিস তো ঠিক!

—নিশ্চয়, আমি কি যে সে লোক, স্বয়ং পরেশ ভট্‌ভ্যাল, খাঁটি বাঘ-ভালুকের দেশে বাস—ইচ্ছে করলে এখান থেকেই টান মেরে দু'চারটে তোর সামনে হাজির করতে পারি।

—তুই যা পারিস তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। কাল একবার আমার সঙ্গে চল, অন্ততঃ যে ভালুকটা আজ পেলাম না, সেটাই সামনে এনে দে, তাহলেই আমার চোদ্দপুরুষ বর্তে যায়।

ভট্‌ভ্যাল একখানা চেয়ারে থপ্ করে বসেই বললে,—সে কি রে, তুই কি শিকারে এসেছিস নাকি ? কী পেলি ? হরিণ, পাখি, সাপ, খরগোশ বলে যা বলে যা—

—হরিণ, পাখি, সাপ, খরগোশের ঝুলিটা তুই এখন শিকেয় তুলে রাখ—ওসব মেরে আমি হাত কালি করি না !

—ওরে ববাবাঃ ! তবে কি বাঘ-ভালুক ?

মিলিটারী কায়দায় টেবিলের ওপর থেকে টুপিটা তুলে একটা মোশন দেখিয়েই অর্জুন সেন গর্জে ওঠে—আলবত্ !

ঘরের একপাশে ঢালা ফরাশের ওপর গড়গড়ি মশাই গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, হঠাৎ উঠে বললেন,—তারপর ক্যাপ্টেন সেন, আপনার সেই শিকারের গল্পটা শেষ করুন।

অর্জুন সেন তাঁকে থামিয়ে বললে—গল্প কেন বলছেন ? এটা তো কল্পনা বা মিথ্যে দিয়ে তৈরী নয় যে গল্প হবে—নিছক সত্য ঘটনা, আজই যা ঘটেছে। আর একটা কথা জেনে রাখুন, সত্যের সঙ্গে মিথ্যের সন্ধি চলে না।

তারপরেই ভট্‌ভ্যালের দিকে চোখ তুলে বলে—এক রাউণ্ড চা না হলে জমছে না ভাই, আর একবার বলে এসো।

আবার চা পর্ব শুরু হোল। এক চুমুক খেয়েই অর্জুন সেন বলতে শুরু করে—

—বুঝলি পরেশ, তোদের এদিকটায় শিকার প্রচুর। বেরিয়েছিলাম বাঘের খোঁজে কিন্তু পেয়ে গেলাম একটা ভালুক।

—কই তোর শিকার কোথায় ?

—আরে শিকার তো জঙ্গলে। বহাল তবিয়তে না হলেও, দু'দুটো গুলি খেয়ে ভালুকটা নিখোঁজ হয়ে গেল।

—কী রকম, কী রকম ? আরো একটু আগে থেকে ধরতে হবে যে।—গড়গড়ি মশাই আড়মোড়া ভেঙ্গে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

সুরেন ভায়া পকেট থেকে একটি ছোট্ট কৌটা বের করে সরষে প্রমাণ একটি দ্রব্য চায়ের কাপে ফেলে দিয়েই কাপটা শ্রীমুখে ধরলেন। তার-বাবু কটাক্ষে সেদিকে গড়গড়ি মশাইএর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—বলুন, ক্যাপ্টেন সেন, আপনার আজকের শিকার পর্বের কথা। সংক্ষেপেই বলবেন, রাত হয়ে গেল।

অর্জুন সেন খালি কাপটা ঠক্ করে সসারের ওপর নামিয়ে রেখে বললে—দু কথায় শিকার-কাহিনী বলা চলে না—যেমন চলে না বন্দুক হাতে থাকলেই শিকার করা। থাক সে কথা; বুঝলি পরেশ প্রত্যেক বছরই শীতের সময়টা আমার শিকারে আসা চাই। ডুয়ার্সের জঙ্গলে শিকার প্রচুর, এ খবরটা আমার জানা ছিল; এবারও তাই জনচারেক সঙ্গী যোগাড় হতেই, ব্যস্, বেরিয়ে পড়া গেল।

অর্জুন সেন বলে যায়,—তোদের স্টেশনে নেমেই আমরা সোজা পুবদিকে রওনা হলাম। অবশ্য, আমার এক বন্ধু, এখানকার চা-বাগানের ম্যানেজারবাবুর বন্দোবস্তের কোন ত্রুটি ছিল না—জীপগাড়িখানা তিনি স্টেশনেই রেখেছিলেন। তাঁর বাসায় গিয়ে চা টা খেয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই আমরা ক্যাম্পের দিকে রওনা হলাম।

বামপন্থী তার-বাবুর চোখের তারায় জিজ্ঞাসা—একটা না একটা কিছু বলা চাই—

—কোন্ চা-বাগান? কালচিনি নিউল্যাণ্ডস্ না রায়মাটাঙ?

বাধা পেয়ে অর্জুন সেনের বড় বড় চোখ দুটো জ্বলে উঠল। ভ্রূভঙ্গী করে বলে,—কোন্ চা-বাগান হলে আপনার সুবিধে হয়! শিকারের কথা হচ্ছে, শুনে যান।

তার-বাবু ধাড়ামশাই তাড়া খেয়ে আপাততঃ নিরস্ত হলেন।

—ক্যাম্পটি বেশ পছন্দসই। আমরা সেখানে খানিকটা বিশ্রাম করেই বেরিয়ে পড়ি। তখন বেলা প্রায় দশটা। সূর্যের আলো ঘন জঙ্গলের মধ্যে সূক্ষ্মরেখায় মাটির ওপরে খানিকটা আলো ছড়িয়ে দিয়েছে, ভেতরে ঢুকলে মনে হয় না যে জঙ্গলের বাইরে আর কোনও জগৎ আছে। আমরা কজন এগিয়ে চলেছি—কিছুটা দূর গিয়েই দেখতে পেলাম একটা পার্বত্য নদী এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে। জলের স্রোত তেমন কিছু নেই, কিন্তু জঙ্গলের সেই স্তব্ধতার মধ্যে একটানা ঝিরঝির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

অদূরে পোস্টাফিসের এক রানার মেল নিয়ে ঝুমঝুমি বাজিয়ে ছুটে আসে। আমাদের সামনে এসেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল—তার হাতের সড়কিটা তুলে ধরেই বললে—বাবুরা হুঁশিয়ার থাকবেন, ভালুক বেরিয়েছে!

—অ্যাঁ, সে কি, কোথায়? কোন্ দিকে?—আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম, কিন্তু এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করিনি।

খানিকটা দূরে জমিটা ক্রমে চড়াই হয়ে গিয়েছে, তার মাঝখান দিয়ে মস্ত একটা চওড়া ফাটল—ভেতরে স্যাঁতসেতে অন্ধকার। অতীতে ভূমিকম্পে অথবা কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ওই ফাটল শুরু হয়েছিল, এখন সেটাকে নালাই বলা চলে।

এপাশেওপাশে ডুমুর আর তার সঙ্গে আরও দু'চারটে বন্য ফলের গাছ। গাছের বাকলে ভালুকের আঁচড়ের দাগও সুস্পষ্ট। বোঝা গেল এ দিকটায় ভালুকের আনাগোনা। হঠাৎ আমার সঙ্গী ভল্টু বলে উঠল—সাহেব, ওই যে দূরে কালো মত কী যেন একটা নেমে আসছে—ওটাই নিশ্চয় ভালুক।

আমরা একপাশে সরে দাঁড়িয়ে নিজেদের আড়াল করে নিই। কিছুক্ষণ পরে শুকনো পাতার ওপর মড়মড় শব্দ। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে তার দেহটাকে আর দেখা গেল না।

চা-বাগানের ম্যানেজারবাবু এদিককার রীতিনীতি ভালই জানতেন। তিনি খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। হঠাৎ তাঁর চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল—ওই ভালুক—ওই যে গাছের ওপরে!

তাকিয়ে দেখি, গাছের মগডালের ওপরে ভালুকটা তার সমস্ত দেহটাকে মেলে ধরেছে, যেন সেখান থেকে অন্য কোনও গাছে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

প্রায় একই সঙ্গে আমার আর ভল্টুর বন্দুকের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গেই ভালুকটার সামনের পা দুটো লম্বা হয়ে যায়—একটা ভীষণ আর্তনাদ করে জানোয়ারটা নীচে পড়েই জঙ্গলের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য। বুঝলাম, ভালুকটা আহত হয়েছে। তবে তার গোঙানির আওয়াজ ক্রমেই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর, আর তার সঙ্গে জঙ্গল ভেঙে যাওয়ার শব্দটা বুঝিয়ে দিল যে জানোয়ারটা দূরে, আরও দূরে ছুটে চলেছে।

আমাদের মধ্যে কেউ বললে, চল ধাওয়া করি। আবার কেউ সাহস পায় না! তাছাড়াও, ভালুকটা হয়ত তখন সেই বিরাট ফাটলের ওপাশে। অন্ততঃ তার গোঙানির শব্দ সেটাই জানিয়ে দিল। ঠিক এমনি সময়, চা-বাগানের এক চাপরাসী ছুটে এসে ম্যানেজারবাবুর হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিলে।

—কী হল আবার! কিসের টেলিগ্রাম? আমাদের সমবেত প্রশ্নের উত্তরে ম্যানেজারবাবু বললেন—তাঁকে তখুনি ফিরতে হবে, কলকাতা থেকে বড় সাহেব চা-বাগান ইন্‌স্‌পেক্‌সনে আসছেন।

জিজ্ঞেস করি—কবে আসবেন?

বন্ধুটি উত্তর দিলেন—এই কাল বাদে পরশু।

—তবে এখুনি ফিরবে কেন?

—না না, অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে; তাছাড়া কুলীদের একটা গণ্ডগোল চলছে—তারও একটা ব্যবস্থা করা চাই। তারা সব স্ট্রাইকের নোটিশ দিয়েছে কিনা! কাল বরং তোমরা শেষ চেষ্টা করে দেখো, তবে আমি আর আসবো না। জীপখানা কালই সন্ধের মধ্যে আমার বাংলোতে ফিরে আসা চাই—জানই তো খোদ হর্তাকর্তা স্বয়ং আগমন করছেন।

আমাদের বামপন্থী তার-বাবুটি অবাক্ বিস্ময়ে গল্প শুনছিলেন, একটা লম্বা নিশ্বাস টেনে বললেন—আচ্ছা বেরসিক যাহোক। বড় সাহেবগুলোই তাল কেটে দেবার এক একটি অবতার। এই দেখুন না, আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যদি একবার মেমো পাঠান তিনি আসবেন—আমাদের অন্নজল ঘুচে যাবার দশা।

সুরেন ভায়া যদিও ঝিমুচ্ছিলেন, তিনিই বা এই সুবর্ণসুযোগের অপব্যবহার করবেন কেন? জড়িতস্বরে বললেন—তবেই বোঝ ভায়া, কাঁচা পয়সার চাকরিটা কেন ছেড়ে দিলাম। গুলি মারো চাকরির মুখে।

গড়গড়ি মশাইয়ের সংযতভাবে একটি মাত্র মন্তব্য—ওসব একই কথা! আমাদের যেমন ইন্‌স্‌পেক্‌টর সাহেব—একবারটি এলে সবাইকে তচ্‌নচ্‌ করে ছাড়েন।

ভট্‌ভ্যাল তাদের কথায় যোগ না দিয়ে অর্জুন সেনকে বললেন—তারপর?

—তারপর আর কি? স্ট্রাইক দি টেণ্ট—ডেরাডাণ্ডা তোল, ঘরে ফিরে যাও। অবিশ্যি আমারও কলকাতায় ফেরবার তাড়া ছিল, কিন্তু গুলি করা ভালুকটাকে না পেলে যেন মনটা সুস্থির হয় না। এদিকে তোর সঙ্গেও দেখা করার ইচ্ছে, তাই বন্ধুর কাছে অনুমতি নিয়ে চা-বাগানের গাড়িতেই স্টেশনে চলে এলাম—তারপর তোর কোয়ার্টার খুঁজে নিতে আর বিলম্ব হল না। যাকগে, এখন আমি স্বয়ং তোর

সামনে উপস্থিত, অতিথিসৎকারে ধন্য হবার সুযোগ তোকে দিলাম—একটু ভালমন্দ খেতে দে, বড্ড খিদে পেয়েছে।

—সে কথা ঠিক। শিকারের হুজুগে অ্যাদ্দিন পরে যখন এই পুরনো বন্ধুকে মনে পড়ল, আর এই গরিবখানায় পায়ের ধুলো দিয়ে আমায় বাধিত করলি, নিশ্চয়ই তা করতে হবে বইকি!—ছোটবাবুর কণ্ঠে অভিমানের সুর।

তাকে জড়িয়ে ধরে অর্জুন সেনের বিকট হাস্য—যেন বন্ধুকে অনেকদিন না দেখার দুঃখ পরেশবাবুর মন থেকে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল।

ভট্‌ভ্যালকে আলিঙ্গনমুক্ত করে অর্জুন সেন আবার বলে ওঠে—রাত ক'টা বাজলো, তার খোঁজ রাখিস?

—নিশ্চয়ই, মোটে সাড়ে আটটা। শীতকালের রাত্তির হলেও এমন আর বেশী কী? তারপর তোর শিকার কি এখানেই শেষ?

—নিশ্চয়ই নয়; আগামী কাল পর্যন্ত মেয়াদ। জীপখানা ভোরেই আসবে স্টেশনে। তোরা কেউ যাবি নাকি?

বামপন্থী তার-বাবুর বাম স্কন্ধ হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠল। তিনি পরেশবাবুর মুখের দিকে চাইলেন—তাঁর ছুটি নেই। পরেশবাবু গড়গড়ি মশাইয়ের দিকে চাইলেন—তাঁর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। গড়গড়ি মশাই সুরেন ভায়ার দিকে আঙুল দেখাতেই তিনি মাথা দুলিয়ে বললেন—যেতেই যদি হয়, দুজনেই যাবো, নইলে আমি একা নয়। চলো না হে গড়গড়ি, কাল তো রবিবার, তোমার ছুটি। তার-বাবু তুমিও চল না—পোস্টাফিস তো কাল বন্ধ।

বামপন্থী তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানালেন—সেটি হবার যো নেই! রবিবারটাই আমাদের লক্ষ্মীবার—লেট্‌-ফী'র পয়সাটা ফেলনা নয়।

—বেশ বেশ, তবে আমি আর সুরেন ভায়াই যাবো—না হয় একটু বেলাবেলিই ফিরে আসা যাবে। কী বলো হে ভায়া!—গড়গড়ি মশাইএর বেপরোয়া ভাব, যেন সাহসের অনুমাত্র অভাব নেই।

সুরেনবাবু ঢোঁক গিলে বললেন—তা, তা যখন বলছো—না হয় যাওয়াই যাবে। তবে কী জানো? আমার গিন্নীর শরীরটা তত জুতসই নয়।

তার-বাবু একটা হাই তুলে তুড়ি বাজিয়ে বললেন—তাহলে এবার ওঠা যাক, কী বল হে ভট্‌ভ্যাল ?

এমন সময় দ্বারপ্রান্তে ভট্‌ভ্যালের ছোকরা চাকরটি মুখ বাড়িয়ে বললে—মা বলে দিলেন, আপনারা এখানেই খেয়ে যাবেন।

গড়গড়ি মশাই উঠি উঠি করেও উঠতে পারছিলেন না। শনিবারের সন্ধেটা পরেশ ভট্‌ভ্যালের বাড়িতেই তাঁদের কাটে। তাস পাশা খেলা হয়—রাত্রে খাবারের ব্যবস্থাও থাকে। আজ সম্মানিত বন্ধুর আগমনে সেই আয়োজনটা বহাল থাকবে কিনা, সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। এবার তিনি সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন—আজ কি মাছ যোগাড় হল ?

চাকরটি কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বামপন্থী তার-বাবু সোচ্ছ্বাসে বলেন—এ প্রশ্ন অবান্তর। মাছের ব্যাপারীর কল্যাণে আমাদের ছোটবাবুর বাড়িতে ও জিনিসটার অভাব কখনও হয় না। সেরা মাছটা এখানে নামিয়ে নিয়ে তবে মালের ছাড়পত্র লেখেন আমাদের এই ভট্‌ভ্যাল। তাছাড়াও 'টু পাইস্'—বেশ পকেটে আসে।

সুরেন ভায়া একটা ঢোঁক গিলে বলেন,—সে তোমরা যাই বল বাপু, খাওয়াতে জানেন বটে পরেশবাবুর গিন্নী—রান্নাও বেশ চমৎকার।

এই সব আলোচনার ফাঁকে ভট্‌ভ্যাল এক চক্কর রান্নাঘরের দিকে ঘুরে এসেই বললেন—সামান্য একটু দেরি আছে। ততক্ষণ ভালুক শিকারের গল্প শোনা যাক। অর্জুন, তোর স্টকে আর কিছু থাকে তো বল্।

অর্জুন সেন কিছু বলার আগেই তার-বাবু বললেন—শিকারের গল্প আমি তেমন জানি না বটে, তবে ভালুকের হাবভাব সম্বন্ধে আমারও কিছু জানা আছে—মানে, আমার এক খুড়্‌শ্বশুর খুব বড় শিকারী কিনা !

সুরেন ভায়ার টিপ্পনী—ওঃ, শোন কথা—তবেই হয়েছে !

—তার মানে ? জানি না আমি ? তবে শোনো। আমার খুড়্‌শ্বশুর একবার রাজপুতানার জঙ্গলে ভালুক শিকারে গিয়েছিলেন। একটা মাদী ভালুক তার বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—বোধ হয় খাবারের খোঁজে। আমার খুড়্‌শ্বশুর ভালুকটাকে গুলি করতেই বাচ্চাটা ছিটকে পড়ে গেল—ভালুকটাও ছুটে বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় গুলিটা লাগলো বাচ্চাটার পায়ে। সেটা চিৎকার করে উঠতেই, ধাড়ী ভালুকটা সেখানে ফিরে আসে আর বাচ্চাটাকে এমন ভাবে কোলের মধ্যে চেপে ধরে, ঠিক মা যেমন তার ছেলেকে বিপদ্ থেকে বাঁচাতে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

এই দৃশ্য দেখে আমার খুড়্শ্বশুর আর গুলি করেননি। কেমন একটা তাঁর মায়া জন্মে গেল। ওদিকে ধাড়ী ভালুকটা বাচ্চাটিকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে উধাও।

গড়গড়ি মশাই মাথা নেড়ে বললেন—আমি কিন্তু কেতাবে পড়েছি, বাঘের চাইতেও ভালুক বড় সাংঘাতিক জীব। বাঘকে আক্রমণ না করলে বা কোনও ভয় দেখাবার কারণ না ঘটালে সে প্রায়ই পালিয়ে যায়, কিন্তু ভালুক বড় খুঁতখুঁতে প্রাণী; যদি একবার তার মাথায় ঢোকে তার শত্রু কেউ সেখানে আছে, তাহলে সে, সামনে পেলেই, বুঝলে কিনা, সোজা আক্রমণ করবেই করবে। মানুষের পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বের করে তবে ছাড়ে।

অর্জুন সেন চুপ করে এই সব আলোচনা শুনছিল, হঠাৎ উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে তার সহকারীকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে এনে গল্পের আসরে হাজির করল।

—এই যে দেখছেন, এর নাম ভল্টু ভগৎ। জাতে পালোয়ান—ভালুক সম্বন্ধে এর মতামতটাও আপনারা শুনে রাখুন। কিরে ভল্টু, বলবি নাকি?

ভল্টু একটা সেলাম বাজিয়ে বললে—বলে আর কি হবে সায়েব, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ভট্ভ্যালের উৎসুক প্রশ্ন—কী রকম?

ভল্টু তার কোমরের বেল্টটা একটু কষে নিয়ে বলতে শুরু করে,—গেল বছর আমরা গিয়েছিলাম ভাগলপুর হয়ে সাহেবগঞ্জের দিকে। একটা জঙ্গলে ভালুকের আস্তানার খোঁজ পেয়েই আমরা সেখানে ক্যাম্প করি। সমস্তটা দিন ঘুরে ফিরেও কোনও হদিস পাই না। অথচ জোর খবর যে একটা ভালুক বেরিয়েছে। তাহলে সেটা গেল কোথায়? খোঁজখবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত জানা গেল, ভালুকটা একবার বাইরে বেরিয়েই আবার তার আস্তানায় ঢুকে পড়েছে। আমরা সেই গর্তের মুখে ভীষণ হই-হল্লা লাগিয়ে দিলাম—কিন্তু ভালুকটা কিছুতেই বের হতে চায় না।

ভালুকটা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দুহাত মেলে···

অগত্যা সায়েবের হুকুমে একটা লম্বা গাছের ডাল কেটে, তার মাথায় খান তিনেক রুমাল বেঁধে, আগুন ধরিয়ে, গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তাতেও কোন পাত্তা নেই। তখন অনেকগুলো শুকনো পাতা সেই সুড়ঙ্গের মুখে জমা করে আগুন লাগিয়ে দিলাম। রাশি রাশি ধোঁয়া সেই সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে পড়তেই বুঝি শ্বাসকষ্ট হওয়ায় ভালুক ছুটে বেরিয়ে এল আর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সায়েবের গুলিতে ঘায়েল। গুলি খেয়েই ভালুকটা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে দু হাত মেলে সায়েবের দিকে তেড়ে আসতেই সায়েবের দুই নম্বর গুলি ভালুকের বুকের ওপর ঘোড়ার খুরের মত সাদা জায়গাটায় লাগতেই

একদম অক্কা। গুলিটা তার কলজে ভেদ করে পাঁজরা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, তাই না সায়েব ?

এমন সময় ভেতর থেকে ডাক পড়তেই সবাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। ভট্ভ্যাল সসম্মানে অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে আহারে বসলেন। চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়র ত্রুটি ছিল না। রান্নাও চমৎকার। উদরাময় রোগে ভুগলেও হয়ত এ সুযোগ কেউ ছাড়ে না। ভূরিভোজনের পরেই বিদায় নেবার পালা।

সেই সময়েই ঠিক হয়ে গেল—পরদিন ভোরে সকলেই একজোট হয়ে প্রস্তুত থাকবে—চা-বাগানের জীপ গাড়িটা এলেই তখুনি রওনা হবে। গড়গড়ি মশাই গড়গড়ার নলে শেষ টান দিয়ে সুরেন ভায়ার সঙ্গে বেরিয়ে যেতেই বামপন্থী তার-বাবু তাঁর বাঁ পায়ের দুর্বলতাকে বহন করে দুলকি চালে তাঁদের অনুসরণ করলেন।

এদিকে ভট্ভ্যালও রুটিন মাফিক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নেবার পর অর্জুন সেনের কাছে শুভরাত্রি জানিয়ে গুটিগুটি চললেন স্টেশনের দিকে। নাইট ডিউটি—শেষ রাতে যে ব্যালাস্ট ট্রেনখানা যাবে, তার লাইন ক্লিয়ার দিয়ে তিনি ঘরে ফিরবেন। স্টেশনের ছোট্ট ঘরে টিমটিমে একটি আলো। টেবিলের ওপর একটা শতরঞ্জি বিছিয়ে পরেশবাবু শুয়ে পড়লেন। সময়মত পয়েণ্টস্‌ম্যান্ যথারীতি তাঁকে ডেকে তুলবে।

রবিবার। সবে ভোর হয়েছে ; অর্জুন সেন ঘুম থেকে উঠেই দেখতে গেল তার সঙ্গীদের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে কি না—বলাই বাহুল্য, তারা সব বহু পূর্বেই তৈরী হয়ে বসে আছে। ভন্টু ভগৎ খাকী হাফ্‌প্যাণ্ট হাফশার্ট পরে পায়ে পটি আর বুটজুতো লাগিয়ে সামনের ফাঁকা জায়গায় পায়চারি শুরু করেছে। তার কাছেই ক্যাপ্টেন সাহেব শুনলেন, শেষরাত্রে পরেশ ভট্ভ্যাল যখন বাসায় ফিরেছেন, ভন্টুর ঘুম তখনই ভেঙ্গে যায়।

অর্জুন সেনও তৈরী হয়ে নিল। চা-পর্ব শেষ হতেই জীপ গাড়িও হাজির। ইতিমধ্যে পরেশবাবুও ঘুমভাঙ্গা চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। যাত্রার সময় উপস্থিত ; পরেশবাবু নাইট ডিউটির অজুহাতে বন্ধুর কাছে অব্যাহতি চাইলেন। পেয়েও গেলেন তৎক্ষণাৎ। কিন্তু গড়গড়ি মশাই আর সুরেন ভায়ার পাত্তা নেই। এমন সময় ছোট বড় দুটি চরণ নিয়ে গুরুলঘু ছন্দে তার-বাবুও এসে হাজির।

তার-বাবুই তারের খবর। টরেটক্কায় যেমন তাঁর আঙুল নাচে, তেমনি তাদের মুখের সামনে আঙুল নাচিয়ে দুঃসংবাদটি জানিয়ে দিলেন—হেডমাস্টার মশাইয়ের পেট খারাপ আর সুরেনবাবুরও তদ্রূপ। তার সঙ্গে একটুখানি মন্তব্য হবে নাই বা কেন? কাল ঠেসে যা খেয়েছে! অর্জুন সেন বুঝে নিল এঁরা দুজনেই শিকারের সঙ্গী হতে নারাজ। বেঘোরে প্রাণটা দিতে কারই বা এত দায় পড়েছে।

—উত্তম কথা! তাহলে চললাম ভাই পরেশ, পারি তো ফেরবার সময় দেখা করে যাব—অর্জুন সেন সেনা ফুলিয়ে তার রাইফেলটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়াল।

পরেশবাবুর সানুনয় অনুরোধ—পারি তো নয়, পারতেই হবে। গিন্নী বিশেষ করে বলেছেন, আর জানোই তো, একবার লোকজন এলে ভাল করে না খাইয়ে কি ছেড়ে দেওয়া যায়? এই নির্বান্ধব পুরীতে উনি তো এই নিয়েই আছেন।

মালপত্র বোঝাই হতেই অর্জুন সেন ও তার চারজন অনুচর গাড়িতে চেপে বসল—খানিকটা ধুলো উড়িয়ে জীপখানা ডাইনে মোড় নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোটর পথে মাইল দেড়েক পরেই চা-বাগানের সীমানা। মাঝে মাঝেই দুই একটা করে বড় গাছ, ছোট ছোট চা-গাছগুলির ওপর মোড়লী করবার সুযোগ পেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

চা-বাগানের গেটে উপস্থিত হতেই ম্যানেজারবাবু বললেন—আমার তো যাওয়া হলো না, তোমাদের জন্যে সেখানে সব ব্যবস্থাই করা আছে—খাওয়া দাওয়া মায় বীটার পর্যন্ত। তাছাড়া গাছের ওপর একটা মাচানও বাঁধিয়ে রেখেছি। বীটারদের কাজ হয়ে গেলে কিছু বখশিশ দিয়ে বিদায় দিও। জানোই তো ওরা ছাপোষা মানুষ।

ভল্টু ভগতের ত্বরিত উত্তর—হাঁ হাঁ, সব হোবে—বখশিশ জরুর দিতে হোবে—লেকিন্ জানোয়ার কুছ্ মিলে, তব্ না—

অর্জুন সেন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,—আর লেকিন্ টেকিন্ নয়, দিতে হবে এই কথা। আচ্ছা এবার আমরা চলি—গুড্ বাই।

ম্যানেজারবাবু বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে হাত তুলে বললেন—শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

হুহু শব্দে মোটর ছুটে চলেছে—ক্রমে চা-বাগানের সীমা পার হয়ে গতকালের সেই তাঁবুর কাছে তারা পৌঁছে গেল। মোটর থেকে নামবার সময় টর্চটা অর্জুন সেনের পকেট থেকে পড়ে যেতেই ভল্টু সেটা কুড়িয়ে হাতে দিলে।

বীটাররা সেখানে হাজির—তারা তৎক্ষণাৎ সারবন্দী হয়ে আদেশের প্রতীক্ষা করে। চটপট দুটো মুখে দিতেই বেলা প্রায় ন'টার সময় শিকার-নাট্যের যবনিকা উঠল।

আগের দিন তারা যেখানটায় ভালুকটিকে গুলি করেছিল, সেটাই হল তাদের কেন্দ্রস্থল। সেই স্থানটিকে ঘিরে, মাইল খানেক দূর থেকে বীটাররা অর্ধ চক্রাকারে জঙ্গল বীট্ করে আসবে, এই নির্দেশ ভল্টু ভগৎ বীটারদের বুঝিয়ে দিতেই তারা লাঠি সড়কি প্রভৃতি নিয়ে চলে গেল।

জঙ্গলের চড়াই পথে প্রায় বিশ গজ দূরে খুব বড় একটা উইঢিবির পাশেই এক গাছে মাচান বাঁধা হয়েছিল। অর্জুন সেন স্বয়ং সেই মাচানে উঠে বন্দুক হাতে প্রস্তুত হয়ে রইল। ভল্টু ভগৎ ও অপর তিনজন সঙ্গীও অদূরে আর একটি গাছে উঠে পড়ে। ভল্টুর হাতে বন্দুক, অন্য তিনজনের কাছে সড়কি ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই—কাজেই তারা বেশ শক্ত হয়েই গাছের ডাল আঁকড়ে বসে রইল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটা ভীষণ হইচই আওয়াজে বীটাররা এগিয়ে আসে। তাদের চিৎকার কখনও উচ্চ কখনও নিম্নগ্রামে শোনা যায়। বেশ বোঝা গেল, সেখানকার জঙ্গল কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। মাঝখান দিয়ে যে বিরাট নালাটা দেখা যায়—সেটাও ঘুরে ফিরে সেই জঙ্গলকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে।

বীটারের দল কাছে এসে পড়েছে, তাদের চিৎকারও যেন শেষ হয়ে যায়। অর্জুন সেন সেই মাচার ওপর চোখ ফুটিয়ে বসে আছে আর মাঝে মাঝেই ভল্টুকে হেঁকে জানিয়ে দেয়, হুঁশিয়ার! কিন্তু কোনও বড় জানোয়ারের দেখা নেই। দু' একটা শেয়াল এদিকওদিক দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ভল্টু সেই গাছের ওপর থেকে দুটো ফাঁকা আওয়াজ করতেই কতকগুলো পাখি উড়ে গেল—এ ছাড়া আর কোন কিছুর আভাস পাওয়া গেল না।

হঠাৎ একজোড়া হরিণ ছুটে বেরিয়ে আসতেই অর্জুন সেন তাক করে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল। একটা গুলি তাদের একটাকে মারাত্মক ঘায়েল করতেই সেটা

বিকট একটা আওয়াজ করে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। [পৃষ্ঠা ২৮

মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল। অন্য হরিণটা দু'তিন লাফে পাশের ঘন জঙ্গলে অদৃশ্য হতেই ভন্টু গাছের ডাল ধরে ঝুলে মাটিতে লাফ দিয়ে নেমেই ছুটল সেই আহত হরিণটার দিকে। হরিণটা শেষবারের মত পা-গুলো ছুড়ে একেবারে অসাড়। ভন্টু ভগৎ সচিৎকারে ঘোষণা করলে,—ব্যস, হো গিয়া সাব !

অর্জুন সেন ধমক দিয়ে বলল—থাক ওটা ওখানেই পড়ে, তুই নিজের জায়গায় চলে যা—আহাম্মক কোথাকার !

কিন্তু ভন্টুর আহাম্মুকি যে কতটা মর্মান্তিক হতে পারে, তা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি।

বীটাররা পুব দিক আবার যেন নতুন উৎসাহে বীট্ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ডও পার হয়নি, এমন সময় পাশের একটা বড় ঝোপের আড়াল থেকে একটা কালো কুচকুচে বিরাটকায় ভালুক টলতে টলতে বেরিয়ে এল—শাঁখের তীব্র আওয়াজের মত তার বুকফাটা আর্তনাদ। সামনের একটা হাত ঝুলে পড়েছে। অর্জুন সেন তখনই বুঝে নিল, এ সেই কালকের গুলি-খাওয়া ভালুকটাই।

ধাঁ করে গুলি করতেই অর্জুন সেন দেখতে পায়, ফিনকি দিয়ে রক্ত তার চোয়াল বেয়ে ঝরে পড়ে, থুতনিটা ভেঙ্গে একেবারে চুরমার। সামনেই ভন্টুকে দেখতে পেয়ে ভালুকটা দু'পায়ে ভর দিয়ে তার দিকেই ছুটে এলো।

মাত্র দশহাত দূরে ভন্টু। সেই দুটো ফাঁকা আওয়াজের পর তার বন্দুকে আর গুলি ভরা হয়নি। সে এখন এই অবস্থায় কী যে করবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে চায়—কিন্তু ভন্টু বেশ অনুভব করে যেন ভালুকের নাক থেকে লম্বা লম্বা নিশ্বাস তার গায়ে এসে লাগছে। সে একটা লাফ দেবার চেষ্টা করতেই একটা লতার সঙ্গে তার পা আটকে যায় আর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে—হাতের বন্দুকটাও ছিটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই জানোয়ারটাও বিকট একটা আওয়াজ করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পাকা ছ'ফুট লম্বা জোয়ান ভন্টু ভগৎ—মিলিটারিতে হাবিলদার—সাহস ও শক্তি দুইই তার অপরিসীম। কিন্তু ঘন অরণ্যে আহত ভালুকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে—এটা কখনও সে কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু আজ এই বেগতিক অবস্থায় পড়েও ভন্টু তার সুপ্ত বীর্যকে যেন জাগিয়ে তুললে—দু'হাত দিয়ে সে জাপটে ধরলে ভালুকটাকে। অর্জুন সেনের গুলি লেগে ভালুকটার চোয়াল আগেই চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলেই দাঁত বসাবার শক্তিও তার ছিল না। কিন্তু তার হাত পায়ের লম্বা কালো নখ দিয়ে আঁচড়ে দেবার ক্ষমতা তখনো বেশ ছিল। তাই দিয়ে সে ভন্টুকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবার চেষ্টা করে! ভন্টুর মুখে তখন অনর্গল ক্রুদ্ধ গালাগালি—যেন ওই ভাবে সে ভালুকটার সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। এমনভাবে মানুষ আর ভালুক জড়াজড়ি করে মাটির ওপর গড়াগড়ি দেয় যে এক মুহূর্তের জন্যও ভালুকটিকে স্থির লক্ষ্যে আনা যায় না। অর্জুন সেন বন্দুক তুলে ক্রমাগত

চিৎকার করে ভণ্টুকে উৎসাহ দেন। অন্যান্য সহকারীদের অবস্থাও তদ্রূপ—প্রিয় সহচর ভণ্টুর আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেন তাদের চোখে মুখে।

ভালুকটা তার রক্তাক্ত চোয়াল বারে বারেই ভণ্টুর মুখে চেপে ধরে, সেও তার পা-দুটোকে ঠিক কাঁচির মত ভালুকের দুটো পা'কে এমনভাবে চেপে ধরে আছে যে সে দুটোও ভালুকটা কোনো কাজে লাগাতে পারে না। কুস্তির প্যাঁচগুলি ভণ্টুর ভালই জানা ছিল। আর সেগুলির সদ্ব্যবহার করে সে বিক্রমের সঙ্গেই সেই ভালুকটার সঙ্গে দস্তুরমত মল্লযুদ্ধ চালিয়ে যায়। তার বাঁ হাতের কনুই দিয়ে ভালুকের কণ্ঠনালী এমন চেপে ধরল যে জানোয়ারটা যেন তার মুখ ভণ্টুর মুখের কাছে আনতে না পারে, আর ডান হাতের বজ্রমুষ্টি সে চালাতে লাগলো ভালুকটার মুখে, পাঁজরে, বুকে। আর তখন তার মুখের কী তোড়—হিন্দী বাংলা মেশানো রংবেরঙের গালাগাল!

কী ভয়াবহ দৃশ্য! অর্জুন সেন একবার চেস্টা করে দেখল গুলি করা যায় কি না—কিন্তু কোনও সুযোগ না পেয়ে অগত্যা মাচানের ওপর থেকে নেমে এল। ওদিকে বীটাররাও চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসে। ইতিমধ্যে সেই মল্লযুদ্ধনিরত বীরযুগল গড়াতে গড়াতে একেবারে সেই বিরাট নালার ধারে এসে পড়তেই অর্জুন সেন বিকট চিৎকার করে ভণ্টু ভগৎকে এই আসন্ন বিপদের কথা জানিয়ে দিল।

কিন্তু দিলে আর হবে কী? ভণ্টুর রক্তে তখন শত্রুজয়ের মাতন লেগেছে। জড়াজড়ি করে তারা গড়িয়েই চলেছে। কেউ কাউকে ছেড়ে দেয় না—উভয়েই উভয়কে বুকে চেপে গুঁড়ো করে ফেলতে চায়। ভালুকটাও জীবনে আজকে বুঝি তার একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল, ভালুকটা তার অবশিষ্ট একটি মাত্র হাতের নখ দিয়ে ভণ্টুর গায়ের জামা ছিঁড়ে তার কাঁধে নখ বসিয়ে দিয়েছে। রক্তে খাকী পোশাক ভিজে উঠল। ভণ্টু সেই রক্ত দেখে পাগল হয়ে ক্রমাগত মুষ্ট্যাঘাতে সেই ভালুকটাকে জর্জরিত করে তোলে।

নীচে গভীর খাদ—আর একবার গড়ালেই সেই খাদের মধ্যে ওই দুটি প্রাণী পড়ে যায় আর কি! অর্জুন সেন সভয়ে লক্ষ্য করে, ভণ্টু এবার নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে। ছুটে সে ধরতে যায় কিন্তু তার পূর্বেই সেই যুধ্যমান মল্লবীর দুটি বহু

নীচে সেই খাদের মধ্যে গড়িয়ে গেল। নীচে অন্ধকার—কিছু দেখতে না পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে অর্জুন সেন মাটির ওপর ধপ করে বসে পড়ল। ভল্টুর বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে বীটার দলপতি বললে—কী সাংঘাতিক ব্যাপার সায়েব, আমরা কোন কাজেই এলাম না! এমন একটা মানুষের মত মানুষকে আজ হারালাম।

অর্জুন সেন তার মনস্থির করে নিয়েছে—মিলিটারী ক্যাপ্টেন, জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেই তাঁর জীবন-যুদ্ধের শুরু। তার মুখে তখন কঠিন সংকল্পের রেখা। সোজা দাঁড়িয়ে সে বললে—চল, আমরাও নেমে যাই খাদের মধ্যে। আমার খুব বিশ্বাস, নিশ্চয় তাকে খুঁজে পাব।

হতাশায় ম্লান সেই শিকারী ও বীটারের দল তখন নেমে চলে সেই খাদের মধ্যে। অর্জুন সেন রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে, টর্চ জ্বালিয়ে পথ দেখায়, এখানে ওখানে পা রেখে গাছের শেকড় ধরে সন্তর্পণে নামতে থাকে। কারো মুখে কোনো কথা নেই—প্রত্যেকেই নিজের নিজের দুঃখ ও চিন্তায় ডুবে আছে! অর্জুন সেন এক একবার আপন মনেই দুঃখ করে—শিকারে না এলেই যেন ভাল হত। প্রথম দিনই যখন লক্ষ্যবিদ্ধ করেও ভালুকটাকে পাওয়া গেল না, তখনই ক্ষান্ত হওয়া বোধহয় তার উচিত ছিল।

অবশেষে অনুসন্ধানকারী সেই দল খাদের তলদেশে উপস্থিত হল। লতাপাতায় প্রতি পদক্ষেপ বাধা পায়—এগিয়ে যাওয়াই কঠিন।

কার গোঙানির শব্দ কানে আসে না? মুহূর্তের মধ্যে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। নাঃ—আর তো কই শোনা যায় না। আবার তারা এগিয়ে চলে। দ্বিতীয়বার সেই গোঙানির আওয়াজ আরও স্পষ্ট কানে এল।

যাক—তাহলে ভল্টু বেঁচে আছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়েই, অর্জুন সেন পাগলের মত সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে চলে। ঘন লতাপাতার মধ্যে ভল্টুর আর্তনাদ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাছে যেতেই দেখা গেল, অর্ধমূর্ছিত ভল্টু ভালুকটার বুকের ওপর পড়ে আছে।

জানোয়ারটার দেহ আছে, প্রাণ নেই। মানুষটির প্রাণ আছে—দেহটা ক্ষতবিক্ষত।

জোড়া বাঘের জোড়া

পাওনাদার

বহুদিন পরে অর্জুন সেন ঠিক মধ্যাহ্নে আমার বাংলোয় এসে হাজির হল। টকটকে গায়ের রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে—হিটলারী গোঁফজোড়া সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে।

হাত ধরে তাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এলাম ; ইজিচেয়ারে বসিয়ে ইলেকট্রিক পাখা চালিয়ে দিতেই—"আঃ কী আরাম!" বলে সোজা সে আরামকেদারায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

—লেবুর রস দিয়ে এক গ্লাস শরবত দিতে বলি, কেমন?

অর্জুন সোজা হয়ে বসে বললে—না, না, শরবত নয়, এক কাপ কফি—খুব কড়া!

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। জুতো ছেড়ে মোজা খুলতে খুলতে সে কৈফিয়ৎ তলব করে—তুই এখানে এই বাংলোয় একা পড়ে আছিস যে বড় ? বাড়ি ঘর ছেড়ে বিবাগী হলি নাকি ?

—এখনও ঠিক হইনি—তবে চেষ্টায় আছি বটে। সেই জন্যেই তো নিরিবিলিতে এই বাংলোটি তৈরি করিয়েছি—তা ছাড়া বন্ধুবান্ধবও দুচারজন আসে।

—ওঃ, এটা তাহলে তোর আশ্রম ? তা বেশ, তা বেশ ! এখন কোন্ মার্গে আছিস ?

—দাবা খেলায়, স্রেফ নিবৃত্তিমার্গে— । দু'চারদিন থাক, তোকেও চ্যাম্পিয়ন্ বানিয়ে দেবে আমাদের গোঁসাইজী।

—তাহলে, গোঁসাইজীও জুটেছে আশ্রমে ? সে আবার কে ?

—আর একটু পরেই তাঁর দর্শন মিলবে। বিকেল চারটের আগেই তাঁর আসা চাই—নইলে তাঁর নাকি হজম হয় না—ভাল কথা, এখন কী খাবি, বল ?

একটা বড় রকমের তুড়ি বাজিয়ে অর্জুন সেন উত্তর দিলে—প্রয়োজন নেই, দুপুরের লাঞ্চ finished.

—এমন ঝড়ো কাকের মত হয়ে এলি কোত্থেকে ?

—আর বলিস কেন ? আমি হলাম মিলিটারী-অফিসার—আমায় কিনা পাঠিয়েছিল—ধাপধাড়া গোবিন্দপুর—সেই নেপাল বর্ডারে—সীমানার স্তম্ভগুলি আমাকেই নাকি পরীক্ষা করতে হবে। যত সব অকাজের ডিম— !

—ভালই তো ! হিমালয়ের টেরাই অঞ্চলে হরেক রকম জন্তুজানোয়ার—রোজ রোজ তোর ঝুলি ভরে নিতে নিশ্চয়ই কসুর করিসনি !

—সে কি আর বাকী রেখেছি ? শরীরটা সেইজন্যেই তো একটু বিকল হয়ে পড়েছে। কিছুদিন বিশ্রামে এটিকে সচল করে নিতেই তো আসা।

—তা হলে তো খুবই ভাল হয়। একসঙ্গে রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে। গুলতানিও করব আর তোর শিকার-কাহিনীও শুনব !

এমন সময় শ্রীমান্ ভৃত্য বাজার থেকে ফিরে এসেই মাথা নীচু করে জানালে—গোঁসাইজী আসছেন।

তার কথা শেষ না হতেই গোঁসাইজীরও সশরীরে আবির্ভাব হল। হাতে একটি হরিনামের ঝুলি, গোটা কপালে চিতা বাঘের মত ফোঁটা কাটা তিলক, গায়ে নামাবলী, পায়ে বিদ্যেসাগরী চটি। এককালে সরকারী চাকরি করতেন—এখন পেনশনভোগী।

গোঁসাইজীকে আহ্বান করে বসালাম। অর্জুন সেনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বলি—আমার বন্ধু, অর্জুন সেন—মস্ত শিকারী!

গোঁসাইজী হাতের কুঁড়োজালিটা কপালে ঠেকিয়ে বললেন—তবে তো বাজীমাত্!

অর্জুন সেন ভ্রুকুটি করে বললে—তার অর্থ?

—ও কিছু নয় ভাই, গোঁসাইজীর কথাই ওই রকম—সব সময়ে দাবা-ভাষায় কথা বলেন অর্থাৎ সব কথাতেই ওঁর দাবার চালের বুকনি দেওয়া চাই।

এমন সময় শ্রীমান ভৃত্য চা দিয়ে গেল। অর্জুনকে চায়ে চুমুক দিতে দেখে বললুম—তরাইতে কি করলি?

অর্জুন গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—এক পরিচিত কুঠিয়াল সাহেবের অনুরোধে আমাকে সেখানে যেতে হয়। যে স্তম্ভগুলি নেপাল ও ভারতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুটি দেশের সীমান্ত নির্দেশ করছিল সেগুলি বর্ষায় নদীগর্ভে ডুবে যায়। তাই জরিপ করে নতুন সার্ভে-ম্যাপ তৈরি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বেসরকারী তরফে কুঠিয়াল সাহেব আমাকে এই দায়িত্ব নিতে বলেন। দেখলুম এক ঢিলে দুপাখি মারা যাবে—কাজও হবে আর তরাইএর জঙ্গলে শিকারও চলবে। তাই এ কাজের ভার নিতে একটুও দ্বিধা করিনি।

চায়ের কাপটি নিঃশেষ করে অর্জুন সেন আবার শুরু করলে—সেখানে গিয়ে দেখি, কাজ বড় বেশী নেই। কোম্পানির সার্ভেয়ার ইত্যাদি সবই ছিল, তবু একজন মিলিটারী অফিসার খাড়া থাকলে কাজটা সহজেই হাসিল হবে, এই জন্যেই আমার উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। অবশ্য ওই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও সেখানে ছিলেন—তিনিও আবার কুঠিয়াল সাহেবের বিশেষ বন্ধু। পরস্পর শুনলাম—কিছু দূরেই তাঁবু পড়েছে, শিকারের আয়োজন চলছে। আর দুটো হাতিও পাঠানো হয়েছে সেখানে।

আমার সঙ্গে ভল্টু ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই। হোল্ড-অল্ আর স্যুটকেস ছাড়া কিছু সঙ্গেও ছিল না—অবশ্য চিরসঙ্গী রাইফেলটা তো ছিলই।

সীমানা জরিপের কাজ সেরে আমরা ফ্যাক্টরিতে ফিরে এলাম। কিছু মুখে দিয়েই আমরা ক্যাম্পে রওনা হই। আমাদের বাহন টাট্টু ঘোড়া; ওটি না হলে ওদিকে এক পাও যাওয়া চলে না। পথও নেহাত কম নয়, মাইল তিনেকের বেশী।

আমি, ভল্টু; কুঠিয়াল সাহেব আরও দু'তিনজন লোক রওনা হলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হেড্ কোয়ার্টার্সে ফিরে গেলেন। ইমামনগর ফ্যাক্টরি ছাড়িয়ে আমগাছের কুঞ্জের মধ্য দিয়ে পায়ে চলার পথে ঘোড়ার পিঠে আমরা এগিয়ে যাই—এধারে-ওধারে কোথাও বা পুকুর, কোথাও বা ডোবা, কোথাও বেশ ঝাঁকড়া একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছ। ক্রমে আমরা পাথুরে জমিতে এসে পৌঁছলাম। ঘোড়াগুলোও সন্তর্পণে পা ফেলে চলে। নেহাত অভ্যস্ত বলেই হোঁচট খায় না। কিছুটা পরেই শুরু হল চড়াই পথ—এবড়োখেবড়ো, উঁচুনীচু শক্ত পাথর—দূরে আকাশের গায়ে হিমালয়ের অস্পষ্ট নীল রেখা দেখা যায়—তরাই অঞ্চলের বনভূমিও সামনেই।

দু' পাশে সবুজ ক্ষেত—তারপরই খানিকটা লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল।

আমাদের ঘোড়াগুলো যখন খুটখুট আওয়াজ করে চলতে থাকে, নিস্তব্ধতার মধ্যে সে শব্দটুকু শুনেই হয়ত কোনও পাখি হঠাৎ পাখার ঝাপট দিয়ে উড়ে পালায়।

বেলা পড়ে এসেছে—একটু তাড়াতাড়ি পথ না চললে সন্ধ্যার আগে সেখানে পৌঁছানো যাবে না। এদিকে কুঠিয়াল সাহেব যদিও দর্প করে বলেছিলেন যে এদিককার পথঘাট সব তাঁর নখদর্পণে, কাজের সময় দেখা গেল তিনিই পথ ভুলেছেন। তাঁকে হাঁক দিয়ে হেসে বলি—সাহেব তোমার নখদর্পণে কি ময়লা পড়েছে, তাই পথ চিনতে পারনি ?

প্রথম যে গ্রাম পেলাম, সেখানকার চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চললাম ক্যাম্পের দিকে। বলা বাহুল্য, এবার আর ভুল হয়নি, আমরা ঠিক সন্ধ্যার পূর্বেই ক্যাম্পে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ি।

আমাদের তাঁবু ছাড়াও আর একটি ছোট তাঁবু খাটানো হয়েছে। সেটা

সাহেবকে হাঁক দিয়ে হেসে বলি—সাহেব তোমার
নখদর্পণে কি ময়লা পড়েছে…[পৃঃ ৩৪

বাবুর্চীখানা। বাবুর্চী তার মালপত্র সমেত আগেই এসে খানা তৈরি করে রেখেছে। ঘোড়াগুলোকে দানা খাওয়াতে বলে, আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট তাঁবুর দিকে অগ্রসর হতে একটি মাঝবয়সী লোক, মাথায় মোটা পাগড়ি, কাঁধে গামছা, হাতে বড় একটা লাঠি—এগিয়ে এসে সেলাম জানায়।

কুঠিয়াল সাহেবের প্রশ্ন—কেয়া রঘুনাথ খবর ক্যা ?

রঘুনাথ করজোড়ে নিবেদন করলে—জোর খবর সায়েব, একজোড়া ধাড়ী বাঘ—তার সঙ্গে একটা বাচ্চা—আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

—আর মুন্নু? উ কাঁহা?

—সে এখনো ফেরেনি, হুজুর!

—বন্দ্‌বস্ত্‌ সব ঠিক হ্যায়?

রঘুনাথ মাথাটা একধারে কাত করে জবাব দেয়,—কাল সকালেই দেখে নেবেন।

বাঘের খবর পেয়ে আমার শিকারী মনটাও লাফিয়ে ওঠে। রাত পোহালেই একটা গোটা দিন পাওয়া যাবে—দেখা যাক কী হয়!

গোঁসাইজী একমনে শুনছিলেন, হঠাৎ নামাবলীটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। শীতের দিন, তার ওপর ফুল পয়েণ্টে ইলেকট্রিক ফ্যান চলছে, এর মধ্যে ঘাম হয় কেমন করে—জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলে উঠলেন—হবে না? শিকার করা তো সোজা নয়, দস্তুরমত একটা যুদ্ধের ব্যাপার। বিশেষ করে ওই আড়াইটে বাঘ যখন ঘোড়ার মত আড়াই ঘরে কিস্তি দিয়ে বসেছে।

—তার মানে?

তিনিও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করলেন—আর কালবিলম্ব না করে ওদের নিপাত করাই বিধেয়। রাধে মাধব! রাধে মাধব!

গোঁসাইজীকে কোণঠাসা করি—আপনারা বোষ্টম মানুষ, জীবহিংসা আপনাদের শাস্ত্রেও আছে নাকি? এটা তো ভাল কথা নয়—

—নয় কেন? আত্মরক্ষার অধিকার সবারই আছে।

গোঁসাইজী কুঁড়োজালিটা মাথায় ঠেকিয়ে অর্ধনিমীলিত চক্ষে বলে যান—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন—

অর্জুন সেনের অট্টহাস্যে বাংলোটা যেন কেঁপে উঠল—সামরিক কায়দায় এক হাত ঊর্ধ্বে তুলে আশ্বাস দিয়ে বলে—আগে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করুন—পরে না হয় উপদেশ বর্ষণ করবেন।

আমতা আমতা করে গোঁসাইজী বলেন—না না, তা ঠিক নয়, তবে কিনা জানেনই তো রাবণ রাজা খুব সমরবিলাসী ছিলেন—সর্বদাই তিনি যুদ্ধের চিন্তায় মগ্ন

থাকতেন ; তাই না মন্দোদরী এই বুদ্ধির খেলা সৃষ্টি করেন। তাই বলি, সব সময়ে শিকারের কথায় মত্ত না হয়ে, এখন আসুন, একটু দাবা খেলা যাক।

অর্জুন সেন জোর গলায় বলে উঠল—Impossible. অযথা বুদ্ধি খরচ করে লাভ নেই, সেটা বরং শিকারে লাগালে ঢের কাজ দেবে। দাবা খেলা-টেলা আমার দ্বারা ওসব চলবে না।

গোঁসাইজী মস্তক কণ্ডুয়নের সঙ্গে আক্ষেপ করে উঠে পড়লেন—তবে আজ যাই। দাবা খেলাটাই যখন হল না, তখন অকারণ প্রাণিহত্যার ইতিহাস শুনে আর কী হবে? রাধে মাধব! রাধে মাধব!

গোঁসাইজী ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

অর্জুন আবার বলতে থাকে—পরদিন ভোরে উঠেই নিত্যকর্ম সেরে, আমরা প্রস্তুত হলাম। প্রথমে কথা হয়েছিল, হাতিতে চড়েই শিকার হবে—কিন্তু সেটা আমার পছন্দ নয়, কাজেই কুঠিয়াল সাহেব আর বেশী জিদ করলেন না। ভন্টু একবার শুধু খুঁতখুঁত করে বলে—পায়ে হেঁটে বাঘের সামনে যাওয়াটা কি ভাল হবে?

—কেন? আমরা গাছের ওপর থাকব।

—তা হলেও যখন মাচান বাঁধা নেই, আমাদের ঝুঁকি নেবার দরকার কি?

ভন্টুকে বললাম—তুই এক কাজ করিস, আমার সঙ্গেই থাকবি, তোর বন্দুক-টাতেও গুলি ভরে সেফ্‌টি দিয়ে রাখিস—দরকার হলে আমিই সেটা ব্যবহার করব।

কথাটা ভন্টুর পছন্দসই হল কিনা বোঝা গেল না। আর আপত্তি না করে সে ঘোড়া আনতে চলে গেল।

অনেকটা দূর—প্রায় তিন চার মাইল যাবার পর দেখা গেল একটা ফাঁকা জায়গায় বহু লোক জমায়েত হয়েছে। কাছে যেতেই দেখলাম, রঘুনাথ হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে বীটারদের নির্দেশ দিচ্ছে। দুটো হাতি নিয়ে বীটাররা দুদিক থেকে ধাওয়া করে আসবে। মাঝে মাঝে গাছে গাছে 'স্টপ্' রেখে অনেকটা সাঁড়াশি আক্রমণ চালাতে হবে, রঘুনাথের এই বন্দোবস্তই ছিল—যাতে আমরা যে দিকটায় থাকব, তাড়া খেয়ে বাঘও সেদিকে আসতে বাধ্য হবে।

যথারীতি নির্দেশ দিয়ে রঘুনাথ কুঠিয়াল সাহেবকে ঠেলে একটা গাছে চড়িয়ে

দিলে। আমি আর ভন্টু হাত বিশেক দূরে আর একটা গাছে উঠে জুতসই হয়ে বসলাম। রঘুনাথও উঠে পড়ল আর একটা গাছে। এই জঙ্গলটার মধ্যেই ব্যাঘ্র দম্পতি সুখের সংসার পেতেছে—এটা খাঁটি খবর। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আশ্বাস পেয়েছি।

প্রায় আধ মাইল দূর থেকে বীটাররা হইহই করে টিন বাজিয়ে ছুটে আসে—গাছের ডালে ডালে, যে সব 'স্টপ্' ছিল, তারাও "আরে রে রে" আওয়াজ তোলে, তা ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে কয়েকটা বড় বড় ঝোপের আড়াল। তার ওপারে কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ কোনও সাড়াশব্দ না দিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে এক জোড়া ছোটবড় ডোরাকাটা বাঘ যেন পার্কে হাওয়া খেতে বেরিয়ে এল—এমনি তাদের বেপরোয়া ভাব। কিছুটা দূরে একটা নদীর খাড়ির দিকেই তাদের গতি—হাবভাব দেখে মনে হয় না যে তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনে কোনও বিঘ্নোৎপাদন হয়েছে।

আমাদেরই অবাক্ হবার পালা। কিন্তু হাতটাও কেমন নিশপিশ করে উঠল। আমরা যে গাছের ওপর বসে আছি, তার পাল্লার মধ্যে আসতেই, আমি পর পর দুটো আওয়াজ করেই ভন্টুর গুলিভরা বন্দুকটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালাম। ভীষণ গর্জন করে একটা বাঘ শূন্যে লাফিয়ে উঠে লাট্টুর মত ঘুরে মাটিতে পড়েই আবার উঠে দাঁড়াল। আবার এক গুলি—নিমেষের মধ্যে দুটো বাঘই যেন হাওয়ার মত কোথায় উপে গেল, তাদের আর দেখতে পেলুম না।

কুঠিয়াল সাহেব চিৎকার করে বললে—কী হল, ফসকে গেল বুঝি?

আমিও গলা ফাটিয়ে উত্তর দিই—গুলি নিশ্চয় লেগেছে—অন্ততঃ একটা যে ঘায়েল হয়েছে, তাতে ভুল নেই—চোখেই তো দেখলেন!

ঠিক এমনি সময়, যে পথে বাঘ দুটো ছুটে গেল, সেই পথে গাছের ওপর যে পাহারা ছিল, সে চেঁচিয়ে বললে—একটা বাঘ জখম হয়েছে, তার গা থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছে—স্বচক্ষে দেখলাম।

ভন্টু আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—কুছ্ পরোয়া নেই সাহেব, শিকার আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। তবে কিছুটা মেহনত করতে হবে এই যা!

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। সমস্ত আয়োজনটাই যেন বিফল মনে হয়। কুঠিয়াল সাহেব তাঁর গাছ থেকে নামবার চেষ্টা করেন। কিন্তু গাছটা ছিল বড্ড বেয়াড়া রকমের

কুঠিয়াল সাহেবের তো ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা !

সোজা। বাকলে লম্বা লম্বা ফাটল—নামতে চেষ্টা করলেই গায়ের চামড়া ছড়ে যাবার আশঙ্কা। সাহেব মাঝপথে থাকতেই আবার একটা তুমুল চিৎকার উঠল—"ওই বাঘ, ওই বাঘ!' সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটা গর্জন। এই না শুনে কুঠিয়াল সাহেবের তো ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা! না পারলে নামতে, না পারলে উঠে ডালে বসতে—গুড়ির মাঝখানটা দু'হাতে প্রাণপণে জাপটে ধরে ঝুলতে লাগলেন।

ঠিক এমনি সময় প্রকাণ্ড একটা বাঘ, মাথাটা খুব বড় একটা হাঁড়ির মত, জঙ্গল থেকে বেরিয়েই বিদ্যুতের মত ছুটে পালায়। কিন্তু আশ্চর্য! কিছুক্ষণ আগেই, দু'দুটো বাঘ যে পথে অদৃশ্য হয়েছিল, এ বাঘটা সে পথে না গিয়ে ছুটে চলল নদীর দিকে; সম্ভবতঃ সেখানেই তার কোনও গোপন একটা আস্তানা আছে। এক লহমার জন্যে দেখা দিয়েই সে আমাদের সকলেরই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

তিন তিনটে বাঘ চোখের সামনে দিয়ে জ্যান্ত পালিয়ে গেলে শিকারীদের মনের অবস্থা কি হয়, একবার ভেবে দেখো। রঘুনাথ যেন চোখে অন্ধকার দেখলে। দারুণ আপসোসে সে ঠোঁট কামড়িয়ে বলে—আজ সায়েবদের মেজাজটা নিশ্চয় ভাল নেই, নইলে এমন শিকার কি কখনও পালিয়ে যায়? কি জানি, এই জঙ্গলের দেবতা কোনও মন্তর দিয়েছে কিনা!

আমরা একজোট হয়ে এইভাবে হা-হুতাশ করি আর এদিকওদিক সজাগ দৃষ্টি রাখি, এমন সময় একটি ছোকরা গোছের 'স্টপ্' এগিয়ে এসে বললে,—আরে, তা নয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি, ওই বাঙালী সায়েবের গুলি খেয়ে ধাড়ী বাঘটা জোর জখম হয়েছে। এই এখানে গুলি—এই এখানে—

ছোকরাটি মহা উৎসাহে তার কাঁধে আর পিঠে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—আর কী রক্ত—বাপ্‌রে বাপ!

রঘুনাথ জিজ্ঞেস করলে—এতটা জখম হয়েও বাঘটা গেল কোথায়?

উত্তরে বলি—এক কাজ করলে হয়—বাঘের পায়ের দাগ ধরে এগিয়ে যাই কি বল?

রঘুনাথের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠতেই কুঠিয়াল সাহেব বলে—চল, চল—দু-চারজনকে সঙ্গে ডেকে নাও।

ভণ্টুও ব্যাপার দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। সেই এবার এগিয়ে গিয়ে চার পাঁচজন বীটার 'স্টপ্'কে যোগাড় করে আনে। এই ছোট্ট দলটি নিয়ে, আমি, কুঠিয়াল সাহেব, ভণ্টু আর রঘুনাথ রওনা হলাম। বাঘের পায়ের ছাপ সব জায়গায় স্পষ্ট নয়, কিন্তু প্রায় দু'শ গজ পর্যন্ত রক্তের দাগই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। একটা জায়গায় এসে আর রক্তের দাগ দেখা গেল না। তারপরই খানিকটা ঘন

জঙ্গল—মাঝে মাঝে দুএকটা খুব লম্বা গাছ। তখন ওই ছোট ঘন জঙ্গলটাকে বীট্ করার হুকুম দিলে কুঠিয়াল সাহেব। তাতেও কোন ফল হল না।

রঘুনাথ কপালে হাত দিয়ে আক্ষেপ করে—আজ নসিবে নেই—আর কি হবে চেষ্টা করে? আবার কাল আসতে হবে।

বেলা তখন খুব বেশী নয়—বারোটা। আমাদেরও শিকারের বারোটা বেজে গেল। তবু, আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে কেমন একটা জোর পেলাম। এক নিশ্বাসে বলে ফেলি—নাঃ, যা থাকে কপালে. চল এগিয়ে যাই। খালি হাতে ফিরব না।

কুঠিয়াল সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেয়—এই তো চাই ক্যাপ্টেন, নসিব টসিব আমরা মানি না—Try, Try and Try again.

ঠিক এমনি সময় অদূরে আর একটা কোলাহল উঠল!

ব্যাপার কি? ভল্টুকে খোঁজ নিতে বলতেই সে ছুটে গিয়ে ফিরে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—এই মাত্র এক জোড়া বাঘ এখান দিয়ে গিয়েছে। আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু মাটির ওপর পায়ের দাগ স্পষ্ট।

আমরা সবাই তখন সেই পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে যাই। ক্রমে সেগুলো যেন নদীর দিকেই আমাদের টানতে থাকে। শেষটায় নদীর ধারে তাদের টাটকা পায়ের দাগ ও সদ্য জলের ছিটে দেখতে পেলাম।

তা হলে কি নদী পার হয়ে গেল? অসম্ভব কি!

মনটা বিমর্ষ হয়ে ওঠে। কুঠিয়াল সাহেব একটা মোটা বার্মা চুরুট ধরিয়ে টান দেয় আর ধোঁয়া ছাড়ে, এমন সময় আবার একটা কলগুঞ্জন কানে আসতেই আমরা পেছন ফিরে চাইলাম।

অবাক্ কাণ্ড! সারাটা দিন যার দেখা নেই সেই মুন্নু হাতে প্রকাণ্ড একটা বর্শা নিয়ে জনকতক লোকের সঙ্গে বীর বিক্রমে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসে। কুঠিয়াল সাহেব অগ্রসর হয়ে প্রথমেই তাকে একচোট খুব নিলে—আরে, তুম্হারা ক্যা হুয়া? কাঁহা থা?

মুন্নু তার এলোমেলো সাদা উঁচু দাঁতগুলো বের করে জানায়, সে এই ধারে

কাছেই ছিল তার লোকজন নিয়ে। বারোটা না বাজলে তো সায়েবদের কাছে আসবে না—রঘুনাথের কাছে সে দিব্যি খেয়েছে।

আমি তো অবাক্! সে আবার কি? জিজ্ঞেস করতেই মুন্নু বললে—সায়েব, রঘুনাথ আমাকে জরুর কসম খাইয়েছিল, আমি যেন আগে আপনাদের নিয়ে শিকারে না যাই। বারোটা পর্যন্ত সময় তার, তারপর আমার। এখন কী হল? শিকার কিছু পড়ল?

সমস্ত কথা শুনে মুন্নু বুক ফুলিয়ে বললে—কুছু চিন্তা কোরবেন না সায়েব, হামি আপনাদের শিকার করিয়ে দেবে, বখ্‌শিশ ভি হামার ডবল্ মিলনা চাহি।

ভণ্টু তার মাথায় একটা চাঁটি দিয়ে বললে—জরুর মিলেগা, পহলে শের তো দেখলাও।

রঘুনাথ এতক্ষণ মাথা নীচু করেই ছিল। মুখ তুলতেই দেখলাম, তার চোখে যেন কিসের একটা ঝলক—চওড়া কপালটা চকচক করে উঠল। সে মাথার পাগড়িটা ভাল করে বসিয়ে সড়কিটা হাতে নিয়ে ছুটি চাইলে—শিকার শেষে আমাদের সঙ্গে আবার মোলাকাত করবে। লম্বা লম্বা পা ফেলে 'বন্দ বস্তে'র মালিক রঘুনাথ আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

আবার নতুন করে বীট্ করা হবে। এবার মুন্নু আমাদের সর্দার—সে আমাদের খানিকটা দূর হাঁটিয়ে একটা খাড়ির ধারে নিয়ে গেল। খাড়ির অপর পারে ঘন জঙ্গল। বীটারের দল সেখানে এসেই মুন্নুর প্ল্যান মাফিক তাদের আক্রমণধারা ঠিক করে নিলে।

সামনেই গোটাকয়েক বড় বড় ঝোপ, তারপরই ছোট বড় পাথরের কয়েকটা চাঁই। তার পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা নদী এঁকেবেঁকে চলেছে। জল নেই বললেই চলে। আমরা সেখানে কিছুটা জিরিয়ে ফ্লাস্ক্ থেকে জল খেয়ে নিলাম।

এমন সময় হঠাৎ একটা চিৎকার দিয়ে বীটারদের মধ্যে একজন ছুটে এল—তার সমস্ত শরীর কম্পমান, উত্তেজনায় যেন কথা বলতে পারে না।

দু হাত তুলে কোনমতে উচ্চারণ করলে—বাঘ—বাঘ—ওই—ওই ঝোপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়ছে!

দ্বিতীয় গুলি করতেই বাঘটা মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেল।
[পৃঃ ৪৪

. . কী সর্বনাশ। আমরা এত কাছে, অথচ কিছুই টের পাইনি ! এত জায়গা ছেড়ে বাঘটা এই হালকা জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে এমন নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকবে, এও কি সম্ভব ?

. . . মুন্নু কয়েকজন বাছা বাছা বীটার সঙ্গে নিয়ে গেল। সেই ঝোপের অপর দিক থেকে তাড়িয়ে বাঘটাকে আমাদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। আমরাও প্রস্তুত।

বীটাররা এবার সব একজোট হয়ে একযোগে হইহল্লা করে এগিয়ে আসে, পাথর ছুড়ে মারে। বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ায় মহাপ্রভু খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন— পর মুহূর্তেই একটা বিকট গর্জন করে সেই অতিকায় ব্যাঘ্র ঝোপগুলোর ভেতর

থেকে এক লাফে বেরিয়ে এসে বীটারদের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু তারা তখন হাতে লাঠি, বর্শা, পাথর নিয়ে এমন ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে এগিয়ে আসে আর তুমুল হল্লা তোলে যে বাঘটা যেন ঘাবড়ে গিয়েই তার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। আমি, ভল্টু আর কুঠিয়াল সাহেব বীটারদের উলটো দিকে ছিলাম—মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেয়েই সে আমাদের দিকে ছুটে এল। হয়ত বীটারদের ওপর তার রোখটা বেশী ছিল বলেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে একবার ফিরে চাইল।

এই স্থবর্ণ স্থযোগ। ট্রিগার টিপলাম। একটি গুলি বাঘের গায়ে লাগতেই যা ঘটল তা এক ভয়াবহ ব্যাপার! বাঘটা শূন্যে একটা বিরাট লাফ দিয়ে মাটিতে পড়েই যেন নাচতে লাগল—আর কী ভীষণ গর্জন! মুহূর্তের জন্য আবার সে তার পেছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল। দ্বিতীয় গুলি করতেই বাঘটা মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেল। কুঠিয়াল সাহেব তার বন্দুক তৈরীই রেখেছিল—কিন্তু গুলি করেনি। আমি তার অতিথি বলেই হয়ত সে এই স্থযোগটা দিল।

দু' দুটো গুলির আওয়াজ শুনে মুন্নু ছুটে এসেই প্রথমে লক্ষ্য করে দেখলে, বাঘটার একেবারে ইতি হয়েছে কিনা, হাতের বর্শাটা দিয়ে দু'চার বার খোঁচাখুঁচির পর নিঃসন্দেহ হয়ে, সে তার মখমলের মত গায়ের ওপরেই শুয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে কুঠিয়াল সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়—হামার বখ্শিশ?

এমনি সময় রঘুনাথও এসে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। প্রতিপদক্ষেপে প্রচ্ছন্ন দম্ভ! পেছনে জনকয়েক লোক একটা ডোরাকাটা জাঁদরেল জানোয়ারকে বয়ে আনে।

সাহেবকে কুর্নিশ করে রঘুনাথ দাবি জানায়—মুন্নুর কাছে হেরে যাবে, রঘুনাথের কপালে সেটা লেখা নেই। আমার পাওনাটা আগে দিতে ভুলবেন না যেন।

একই দিনে আড়াইটে বাঘ

অর্জুন সেন তার এক কিস্তি বাঘ শিকারের গল্প শেষ করেই হাঁক ছাড়ে—এই চা লে আও—গলা যে শুকিয়ে কাঠ! আর বকতে পারি না।

—বকবক করে বকে যাওয়াটাও যেমন পরিশ্রম, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা-টাও ঠিক তেমনি মেহনত। তোমার ওইসব খোঁড়া অজুহাত চলবে না।

হাতজোড় করে বন্ধুপ্রবর রেহাই চাইলেও আমি ঠিক জানি, উসকানি দিয়ে আর একটি শিকারের ঘটনা ওর কাছে কেমন করে আদায় করা যায়। সেই বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া যেই না সঞ্চালন করেছি, সে আবার গা-ঝাড়া দিয়ে দপ্ করে জ্বলে উঠল।

—আচ্ছা, তবে আমার ডায়েরিখানা খুলে তোমার খোরাক যোগাড় করে নাও—না, না, রোসো, একদিনে আড়াইটে বাঘ কেমন করে কায়দায় এনেছিলাম, তার জল-জ্যান্ত ইতিহাসটাই তোমায় শোনাবো।

মেজর সেন ভল্টুকে আদেশ করতেই সে ইয়া মোটা একখানা কেতাব এনে হাজির করে।

চমকে উঠলাম—বই নয়, যেন এক ভল্যুম এনসাইক্লোপিডিয়া !

—সর্বনাশ ! ওর মধ্যেই বাঘ লুকিয়ে আছে না কি ?

অর্জুন সেনের উচ্চহাস্যে ঘরের কড়ি-বরগাগুলো যেন কেঁপে ওঠে—দেয়ালে ফাটল ধরে আর কি !

বিরাটাকৃতি ডায়েরিখানা খুলে কয়েক পাতা উলটেই অর্জুন সেন থেমে গেল। দেখলাম তার ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত, মুখের পেশীগুলি ফুলে উঠেছে, 'ডোণ্ট-কেয়ার' গোঁফজোড়া যেন কোন চুম্বকের আকর্ষণে ঊর্ধ্বমুখী। মিনিটখানেক কী ভেবে নেয়, তারপরই বলতে থাকে ঃ

মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে, কোন্ চুলোয় যাব, সেই কথাই চিন্তা করি। জানোই তো, ব্যাচেলর মানুষ, ঘরের টান বলতে কিছু নেই। কাজকর্মের ফাঁকে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হই-হুল্লোড় করেই জীবনটা কেটে যায়।

এমনি সময় একটি পত্রাঘাত আমার সমস্ত প্ল্যানকে উলটে দিলে। সেই যে নেপাল বর্ডারে সীমানা জরীপের কাজে গিয়েছিলাম, সেখানকার ফ্যাক্টরির সাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধ, অনুগ্রহ করে অন্ততঃ দিন দশেকের ছুটি নিয়েও যেন আমি তাঁর কাছে হাজির হই—খুব বড় রকম শিকারের সম্ভাবনা। তাছাড়া আরও খবর—তাঁর নিজের দেশ থেকেও একজন নামজাদা শিকারী এসেছেন, নাম হাণ্টার। আমি গেলে পার্টি জমবে ভাল।

আর চাই কী ? ভণ্টুকে বলি—তল্পিতল্পা তোল। আজই বেরিয়ে পড়া যাক। তোর আর বাড়ি যাওয়া হল না।

উৎসাহ তারও কম নয়। কিন্তু এবার সে যেন একটু খুঁতখুঁত করে। মর্মার্থ উপলব্ধি করি। তখনই তার হাতে গোটা পঞ্চাশেক টাকা গুঁজে দিয়ে বলি—এই টাকাটা আমার নাম করে তোর পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দে আর সেই সঙ্গে তার কাছে দিন পনেরোর ছুটি চেয়ে নিস ! বোধগম্য হয়েছে কী ?

দু'পাটির বত্রিশখানা দাঁত বের করে ভণ্টু উত্তর দিলে—এটা তাহলে আমার উপরি পাওনা ? আগাম পেয়ে গেলাম ? এবার খুব বড় শিকার না হয়ে যায় না !

—যা এখন, চটপট বাজারে গিয়ে যা যা দরকার সব কিনে-কেটে ঝটপট গুছিয়ে নে।

ভল্টু আমার কম্বিৎকর্মা অনুচর। সব যোগাড়-যন্তর করে নিতেই আদেশ দিলাম—এবার চলো মুসাফির।

নেপালের প্রান্ত দেশে যেখানে সাহেবের ফ্যাক্টরি, সেখানে একবার শিকারে গিয়েছিলাম সে কথা তোমাদের বলেছি।

এবার পৌঁছে দেখি, এলাহি কারবার। সাহেব যেন শিকারের নেশায় মেতে উঠেছেন। 'হোম' থেকে বন্ধু এসেছেন তাঁকে একবার দেখিয়ে দিতে চান—কী রাজসিক চালে তাঁরা ভারতবর্ষে বসবাস করেন।

হাতি, ঘোড়া, লোক-লশকর, কিছুর অভাব নেই। সারি সারি কয়েকটি তাঁবু পড়েছে। লোকজন কারণে অকারণে ব্যস্ত। আমরা যখন পৌঁছলাম—তখন বেলা প্রায় এগারোটা। ফ্যাক্টর সাহেব তাঁর বন্ধু মিঃ হাণ্টারকে নিয়ে তখন ঘোড়ায় চড়ে কোথায় গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আর্দালী, বাবুর্চি, মশালচী যারা ক্যাম্পে হাজির ছিল, তারা আমাদের আদর-অ্যাপ্যায়নের ত্রুটি রাখেনি। চা-পান পর্ব সেরে আমি ও ভল্টু একটু এগিয়ে গেলাম। সামনেই একটা আমবাগান, সেটা পার হতেই ডানদিকে বেশ বড় একটা দীঘি, তার পাড়ে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, তার পরেই এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমিটা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে দূরে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। মাঝে মাঝেই ঘন জঙ্গল।

শিকারের উপযুক্ত স্থান বটে। পথের ধারে একজোড়া বট-পাকুড়ের নীচে আমি আর ভল্টু দুজনে একখানা বড় পাথরের ওপর বসে আছি। দেখা গেল দুটি ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে। কাছে আসতেই দেখি তারা দুজনেই ইওরোপীয়ান। একজন আমার পূর্ব পরিচিত সেই ফ্যাক্টর সাহেব, দ্বিতীয়জন নিশ্চয়ই নবাগত মিস্টার হাণ্টার।

আমাদের দেখেই ফ্যাক্টর সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে প্রথমেই আমার হাত ধরে প্রবল একটা ঝাঁকুনি—তারপরই পরিচয় বিনিময়ের পালা। মিস্টার হাণ্টার লোকটি বেশ অমায়িক ও ভদ্র, কিন্তু চাল-চলনে আমাদের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখার দিকেই ঝোঁকটা বেশী।

ভল্টুর চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না; বিশেষতঃ আমার ওপর কেউ টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এটা তার অসহ্য। প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে মাঝে মাঝে সে আমাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। এবারও যদি তেমনি কিছু একটা করে বসে, তাই

গোড়াতেই গা-টিপুনি দিলাম। সেও আমার ইশারা বুঝে নিয়েই সাহেব দুটির সামনে গিয়ে হাবিলদার মেজরের কায়দায় দু-পায়ের বুট ঠুকে একটা জবরদস্ত সেলাম দিয়ে বসল।

আমরা ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। লাঞ্চ খেতে বেশী সময় লাগেনি। তারপরই তিনজনের গোল-টেবিল বৈঠক। সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত।

গিরিধারীলাল নামে স্থানীয় এক মাতব্বর ব্যক্তির ডাক পড়তেই তার প্রবেশ ও লম্বা কুর্নিশ। তৎপর উক্তি—একটা নয়, দু-দুটো বাঘের অত্যাচারে তাদের গাঁয়ে বাস করা অসম্ভব। বাঘ দেখা যায় না—কিন্তু প্রায় রোজই দু-একটা গরু মোষ ঘায়েল হয়। তাছাড়া মাস তিনেকের মধ্যে জনদশেক মানুষও বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

বাঘকে তারা দেখেছে কিনা এবং কোন্‌দিকটায় তাদের আনাগোনা এটা তার কাছে ভাল করে জেনে নিয়ে ঠিক করা হল, পরদিন খুব ভোরেই কিছুসংখ্যক বীটার পাঠিয়ে জঙ্গল বীট করা হবে। বাঘ যদি বের হয় ভালই, নইলে সামনে যে বিস্তীর্ণ ঘাসের জঙ্গল আছে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যাবে। তাহলেই বাছাধনকে আমাদের সামনে পড়তেই হবে। এছাড়া গত্যন্তর নেই।

ভন্টুকে বলি ঃ এবার খুব হুঁশিয়ার—দেখো, বিদেশী বন্ধু যেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে না যান।

ভন্টু লক্ষ্মী ছেলের মত আত্মসমর্পণ করে—আপনার যা আদেশ, সেই মতই কাজ হবে। কিন্তু যদি সামনেই বাঘ এসে যায়, তাহলে কিন্তু আপনি ছেড়ে দেবেন না—আমিও ছাড়বো না।

আমার পরমভক্ত শ্রীমান অনুচরকে সতর্ক করে দিই—খবরদার, পাগলামি করিসনি! অতিথিকে সর্বপ্রথম সুযোগ দিতে হয়। একটা কাজ কর বরং তুই কাল বীটারদের দলপতি হয়ে যা। যেমন করেই হোক বাঘকে আমাদের সামনে ফেলে দে।

ভন্টু প্রস্তাবটি সরাসরি ডিসমিস করে দিল।

সেদিনের দিনপঞ্জী এখানেই শেষ। সন্ধ্যার আগেই যে যার ক্যাম্পে আশ্রয় নিলাম। ভন্টু আমার পাশেই একটা নেওয়ারের খাটিয়ায় অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল। কেবলমাত্র আমার 'নিদ নাহি আঁখিপাতে'।

তার জ্বলন্ত চোখে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা·

[পৃঃ ৫৮

রাত্রির যে বিশেষ একটা পরিচয় আছে সেটা যেন এর আগে এমন করে অনুভব করিনি। কী যেন একটা রহস্যের হাতছানি একটা বিপদ-সংকুল পরিস্থিতির পূর্বাভাস বারে বারেই আমাকে পীড়া দেয়, একসঙ্গে পনেরো মিনিটের বেশী ঘুম হয় না। হঠাৎ সেই অন্ধকার ভেদ করে বহু দূর থেকে ভেসে আসা গর্জন শুনতে পেলাম। রাইফেলটি বিছানায় আমার পাশেই! লাফিয়ে উঠে গুলি ভরে নিয়ে প্রস্তুত হই।

ভণ্টুরও হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আমাকে তখনো রাইফেল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে সেও উঠে বসে, তারপরই তন্দ্রাজড়িত প্রশ্ন—বাঘের ডাক শোনা গেল না?

—হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়।

—কথাটা তবে মিথ্যে নয়! দিন দশেক এখানে থাকলে গণ্ডাখানেক কুড়িয়ে নিতে দেরি হবে না। কিন্তু স্যার, আমি আর আপনি একই হাতির সওয়ার হব।

পরদিন সকালে উঠেই সাজ-সাজ রব। আমাদের তৈরী হয়ে নিতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগেনি। পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী বীটাররা আগেই রওনা দিয়েছে। তাদের দলপতি পালোয়ান সর্দার। গোটা তিনেক হাতি, বিস্তর লোকজন আর স্টপার তার সঙ্গে।

দুটো হাতি পিঠের ওপর হাওদা নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ফ্যাক্টর সাহেব তাঁর বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুর বাইরে আসতেই আমি ও ভণ্টু তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। ঠিক হল, তাঁরা দুই বন্ধু একটি হাতির ওপর উঠবেন—বাকীটায় আমি আর ভণ্টু!

অতঃপর আমাদের যুদ্ধযাত্রা। পথে কয়েকজন গ্রামবাসী উৎসুক নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে—হাত ইশারায় কী যেন বলতে চাইলো।

অর্ধেক পথ গিয়েছি, এমন সময় পেছন থেকে কয়েকটি লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের দিকেই ছুটে আসে। মুখে নিদারুণ আতঙ্কের ছায়া। একজনের কম্পিত উচ্চারণ —শের, হুজুর, শের, একঠো আদমিকো পাকড় লিয়া!

গায়ের এখানে সেখানে রক্তের ধারা

—সে কী? কোথায়?

সে নিরুত্তর—তার ভ্রু-যুগল তখন দোতলা ছেড়ে তেতলায় উঠেছে।

সাহেব দুজন অনেকটা দূরে। আমার হাতিটাকে ফিরিয়ে নেবার হুকুম দিলাম।

কিছুটা পিছিয়ে আসতেই দেখা গেল একটি লোক খুঁড়িয়ে আসছে। গায়ের এখানে সেখানে রক্তের ধারা—নেহাত পাহাড়ী বলেই একেবারে কাবু হয়নি। তার কাছেই শুনলাম বাঘ তার পিঠে একটা থাবা মেরেছিল বটে, তারপর কী খেয়াল হতেই, তাকে আরও বেশী ঘায়েল না করেই চম্পট। হয়ত সে বুঝেছিল, তার রাজত্বে কোথায় যেন কী একটা গোলমাল চলেছে—তারই প্রতিবাদের নমুনা-স্বরূপ সে মানুষটার পিঠে চাঁটি দিয়েই উধাও।

আমাদের হাতিকে পেছনে দেখতে না পেয়ে ফ্যাক্টর সাহেব ভাবলেন, আমরা হয়ত পথ হারিয়েছি। তাই আমাদের খোঁজে আবার পিছু হটে এলেন। আহত লোকটিকে তখুনি ফ্যাক্টরির হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে আমরা সবাই এবার একসঙ্গে পাশাপাশি চলতে থাকি।

বাঘ যখন একবার বেরিয়েছে, আর একটা মানুষকে ঘায়েল করেও তার রক্তের আস্বাদ পেলো না, তখন শোণিত তৃষ্ণায় সে যে পাগল হয়ে উঠবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই সময় বুঝে সাবধান হওয়া উচিত।

পশ্চিম দিক থেকে প্রবল বাতাস বইতে শুরু করেছে। আমাদের সম্মুখেই একটা বিরাট ঘাসের জঙ্গল। তারও পেছনে অরণ্য-ছাওয়া পাহাড়গুলো ক্রমেই উঁচুতে উঠেছে। বীটাররা এখানেই জমায়েত হয়ে অপেক্ষা করছে—চূড়ান্ত নির্দেশ পেলেই তারা আপন কাজে লেগে যাবে।

প্রথমেই চিন্তায় পড়া গেল—এই ঘাসের জঙ্গলে বাঘটা যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাকে 'বীট্' করে বের করা কঠিন। তার ওপরেও সমূহ বিপদ —যে কোনও মুহূর্তে সে আমাদের ওপর হামলা করবে। বন্দুক তোলার সময়টুকুও দেবে না।

ফ্যাক্টর সাহেবকে জিজ্ঞেস করি—এ অবস্থায় ঘাসের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিলে কেমন হয়?

উত্তর দিলেন হাণ্টার সাহেব—সেইটিই একমাত্র করণীয়, মেজর! আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পালোয়ান সর্দারকে ডেকে আগুন লাগানোর কথা বলতেই তারও চোখে আগুন জ্বলে উঠল। ভীষণ উৎসাহ—সে তখুনি তার অনুচরবর্গের কাছে ছুটে গেল। ঘাসের জঙ্গল প্রায় শুকনো, কাজেই অগ্নি-সংযোগ হওয়ামাত্রই বৈশ্বানরের তাণ্ডব লীলা শুরু হয়ে গেল—তার সঙ্গে বাতাসের মাতামাতি।

দেখতে দেখতে সমস্ত জঙ্গলটা পুড়ে গেল—কিন্তু বাঘ কই? দু'চারটে জন্তু-জানোয়ার প্রাণের ভয়ে সেই ঘাসের জঙ্গল থেকে ছুটে পালালো বটে, কিন্তু ব্যাঘ্র মহারাজ যে কোন্ অজানা আশ্রমে ঘাপটি মেরে বসে আছেন, তার উদ্দেশ নেই।

আমরা আরও এগিয়ে যাই—বীটাররাও এগোতে থাকে। সামনেই আর-একটি বিরাট জঙ্গল—মাঝে মাঝেই এক-একটি প্রকাণ্ড গাছ তাদের ডালপালা বিছিয়ে সেই গভীর অরণ্যকে পাহারা দেয়।

জঙ্গলের অপরদিক হতে 'বীট' শুরু হতেই ভীষণ হই-হল্লার আওয়াজ পাওয়া গেল। নিশ্চয় কোন জানোয়ারের দেখা মিলেছে। আমাদের মধ্যে এইসব গবেষণা চলতে থাকে এমন সময় একটা ফার্ন গাছের ঝোপ থেকে সুন্দর একটি মাঝবয়সী ডোরা-কাটা বাঘ বের হয়েই দে ছুট্। যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ। বন্দুক তুলবার ফুরসত পাওয়া গেল না।

কিন্তু হাণ্টার সাহেব ছাড়বার পাত্র নন—জঙ্গল নড়া দেখেই ধাঁ করে এক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লেন। সেটা চাঁদের দেশে পোঁছে গেল কিনা কে জানে!

ভণ্টুর মুখ বেঁকিয়ে মন্তব্য—সাহেবের নিশানার বহর দেখলেন, স্যার?

তাকে ধমক দিয়ে বলি—চুপ করে বসে থাক। ও তো তবু গুলি করেছে, তুই তো বাঘটাকে দেখতেই পাসনি।

ভণ্টু দমে যাওয়ার পাত্র নয়, বুক ঠুকে বলে—সাহেবও দেখতে পায়নি—আমি বাজি রাখতে পারি।

জানোয়ার দেখা না গেলেও তার পশ্চাদ্ধাবন করাই উচিত,—আমরা হস্তীপৃষ্ঠে এই সিদ্ধান্তই করে নিলাম। খুব তাড়াতাড়ি উলটো দিক থেকে আক্রমণ চালাই। যদিই দৈবাৎ সোজা বেরিয়ে আসে, আমাদের সামনে পড়তেই হবে।

কার্যক্ষেত্রেও দেখা গেল, আমাদের হিসেবে ভুল হয়নি। জঙ্গলের একধার দিয়ে চুপি চুপি সে পালিয়ে যাচ্ছে। আমার নজরে আসতেই ধাঁ করে একটি গুলি। সেটা লাগলো তার সামনের পায়ে। মাটির ওপর একবার গড়িয়ে পড়েই সে হাঁ করে ছুটে আসে—সঙ্গে সঙ্গে কী ভীষণ গর্জন! কিন্তু তার আস্ফালন তখনই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমাদের তিনজনের বন্দুকই একসঙ্গে গর্জে ওঠে—আর চোখের সামনে তালগোল পাকানো বাঘের দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়েই একদম গতাসু।

ভণ্টু সচিৎকারে জয়ধ্বনি দেয়—বাঘটা আমাদের—মেজর সাহেবের গুলিতেই প্রথম ঘায়েল হয়েছে।

ভাগ্যে বাঙলাভাষায় সাহেব দুটির ব্যুৎপত্তি নেই, নইলে আমিই লজ্জায় মরে যেতাম।

ফ্যাক্টর সাহেবও উত্তেজনায় চেঁচামেচি শুরু করলেন। শুধু তাঁর বন্ধু সদ্যসমাগত হাণ্টার সাহেবের আত্মসমাহিত ভাব।

চিৎকার শুনেই বীটার ও স্টপাররা ছুটে আসে। পালোয়ান সর্দার সামনে এসেই তাল ঠুকে দাঁড়ায়—যেন সব কৃতিত্ব তারই।

এদিকে ভল্টু হাতির ওপর থেকে নেমে একটা পাথরের চাঁই বাঘের গায়ে ছুঁড়ে দেখল জানোয়ারটা সত্যিই অক্কা পেয়েছে কিনা।

নিশ্চিন্ত হয়ে বীটারদের সাহায্যে বাঘটাকে অপর একটি হাতির ওপর তুলে বেঁধে নেওয়া হল। বীর-বিক্রমে আমরা দু-চার পা এগিয়ে যেতেই আবার একটা ক্রুদ্ধ গর্জন।

তবে কী জঙ্গলটা বাঘের ডিপো? আরো বাঘ—অনেক বাঘ? সমস্ত দেহটা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে আনন্দ ও বিপদ আশঙ্কা আর উত্তেজনা যেন আমাদের সবাইকে নাচিয়ে তোলে। শিকারের নেশা যাকে একবার পেয়ে বসে তার কাছে কিন্তু পৃথিবীর অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যায়।

তবু ফ্যাক্টর সাহেবকে জিজ্ঞেস করি—এবার কি ক্যাম্পে ফেরা হবে? না—নতুন শিকারের পেছনে?

হাণ্টার সাহেব মুখ খুললেন—বেলা তেমন বেশী হয়নি, একবার চেষ্টা নিতে দোষ কী?

ভল্টু চোখ উলটে ভেংচি কাটে—ভারী আমার শিকারী—তার আবার কথা!

মেজর সেন একটি সিগারেট ধরিয়ে, একরাশ ধূম উদ্‌গিরণের সঙ্গে বলতে শুরু করে ঃ

এবার সংক্ষেপেই বলছি—বেশী সময় নেব না।

বাঘের গর্জনটা যেদিকে শোনা গিয়েছিল, আমরা সেই দিকেই অভিযান চালাই। বীটার হাতিগুলোর ওপরে কিছু লোক উঠেছে। স্টপার যারা ছিল তারা সবাই গাছের ডালে।

প্রায় মাইলখানেক যাওয়ার পর একটা জায়গায় 'মরি' পড়ে থাকতে

দেখা গেল। তার বুকের খানিকটা মাংস নেই—পেটের নাড়ীভুঁড়িও বেরিয়ে পড়েছে।

তাহলে বাঘ নয়—বাঘিনী? বাঘ হলে কোমরের মাংসই প্রথমে খায়। পায়ের চিহ্ন দেখেও বাঘ কি বাঘিনী ঠিক করা যায়। বাঘের দাগ অনেকটা চৌকো ধরনের, বাঘিনীর তা নয়। এখানে সে সুযোগ নেই—জঙ্গলের মাটি তেমন ভিজে নয় যে বাঘের পায়ের ছাপ পড়বে।

অনেকটা দূর দিয়ে ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝরনা। আমরা হাতি চালিয়ে সেই দিকেই যাই। মনে আশা ছিল, ব্যাঘ্র মহোদয় অথবা ব্যাঘ্রী, যিনিই হোন না কেন, এইমাত্র ভোজন-পর্ব সমাধা করে নির্ঘাৎ ঝরনার জল পান করতে আসবেন।

পাঁচ পাঁচটা হাতি গজেন্দ্র গমনে চলেছে। তার আওয়াজ নেহাত কম নয়। মাহুতদের 'খেত' 'মাল্' প্রভৃতি বুলি তো আছেই, আর আমরাও যে মুখ বুজে পথ চলেছি তাও হলফ করে বলতে পারি না।

হঠাৎ সামনের হাতিটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের চারটিও। একটা অস্পষ্ট গুড়গুড় আওয়াজ করেই তারা শুঁড়গুলি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। এখানেই যে আমাদের বাঞ্ছিত মহাপ্রভু কোথাও সংগোপনে বিরাজ করছেন, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

বহু সাধনার ধন ক্বচিৎ সামনে এসে হাজির হয়। কিন্তু সেদিন আমাদের ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না ছিলেন বলতে হবে। নইলে ভল্টুর দিকেই কেন সেই মহামূল্য জানোয়ারটি তার জ্বলজ্বলে দুটি চোখে এমন অগ্নিবৃষ্টি করবে?

আমার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়েই ভল্টু যা দেখালে, সেই অপরূপ দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। দুটো বাচ্চাকে আড়াল করে বিরাটকায় এক বাঘিনী দারুণ আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছে—তার লেজটা ঠিক অর্ধচন্দ্রাকারে একবার মাটিতে একবার শূন্যে।

অর্জুন সেন তার ডায়েরির পাতা খুলে বললে—সেদিনকার সেই ভীষণ অবস্থার কথা আমি ডায়েরিতে টুকে রেখেছি। একটুখানি পড়ে শোনাই: 'তার জ্বলন্ত চোখে

সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, মুখের গহ্বরে মৃত্যুর বিভীষিকা, জিহ্বাগ্রে লেলিহান অগ্নিশিখা, সূচীতীক্ষ্ণ দন্তে দুরন্ত জিঘাংসা, কম্পিত নাসারন্ধ্রে দুর্নিবার ক্রোধ, তার সর্বাঙ্গ ঘিরে যেন প্রলয়নাচন !

হঠাৎ হস্তীর বৃংহতি ধ্বনি—সে যেন ল্যাজ তুলে পালাতে পারলে বাঁচে। মাহুত ডাঙ্গশা দিয়ে তার মাথায় ক্রমাগত আঘাত করে যায়। আমিও এক রাউণ্ড গুলি চালাই। সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণকায়া ব্যাঘ্রী হাতির ওপর লাফিয়ে উঠেই আমার হাওদা ধরে ফেলে আর কি ! ততক্ষণে তার ললাটে নল বসিয়ে ট্রিগার টিপতেই সেই অনন্তবীর্যা ব্যাঘ্রীর ভবলীলা সাঙ্গ হল।

ডায়েরি থেকে এইটুকু পাঠ করেই, অর্জুন সেন মুহূর্তকাল চুপ করে থাকে। তার চোখের তারায় সেদিনের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিজ্ঞা যেন আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হঠাৎ ডায়েরিখানা বন্ধ করেই সে আবার বলতে থাকে—বাঘিনীটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এদিকে সামনে তাকিয়ে দেখি, মাহুত নেই !

গেল কোথায় ?

ভল্টু সোজা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মাহুতপ্রবর একপাশে ধরাশায়ী, তবে অক্ষত অবস্থায়। তার মাথার বৃহৎ পাগড়িটা ছিটকে পড়েছে।

চোখের সামনে এই রক্তজমাট করা ব্যাপার। ফ্যাক্টর সাহেব তাঁর হাতি ছুটিয়ে কাছে এলেন। তারপর হাওদার ওপর সোজা দাঁড়িয়ে হাত তুলে অভিনন্দন জানান ঃ মেজর, তোমার সঙ্গে শিকারে এলে অনেক কিছুই শিক্ষা হয়—ধন্য তোমার সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি !

হাণ্টার সাহেবের মন কিন্তু এদিকে নেই। ভল্টু যে ইতিমধ্যে হাওদা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েছে, তা আমি লক্ষ্য করিনি। সাহেবের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখি, সে মাহুতের ওই ষোলহাত লম্বা পাগড়ির কাপড়টা দুহাতের কনুই পর্যন্ত ক' পাক জড়িয়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ছুটে চলেছে। খুব হুঁশিয়ার কি না ! যাতে কোনও কামড় বা আঁচড় হাতে না লাগে, তাই বুঝি এই সাবধানী প্রক্রিয়া !

বাঘের দুটো বাচ্চার মধ্যে একটি জঙ্গলের একদিকে কোথায় উধাও, আর একটি মায়ের পেছনে আমাদের দিকে ছুটে আসছিল। কিন্তু নেহাতই ব্যাঘ্রশাবক

জ্যান্ত বাঘ ধরে এনেছি, স্যার !

কিনা, ঠিক যেন একটা বড় গোছের বনবিড়াল, তাই উঁচুনীচু জমির ওপর টাল খেয়ে পড়ে।

আমরা সবাই হাতির ওপর থেকে নেমে পড়ি। আমার মাহুতও ইতিপূর্বেই সাব্যস্ত হয়ে স্বস্থানে সমাসীন।

ভল্টুর বাহাদুরি আছে। ছুটে গিয়েই সেই মাতৃহারা ব্যাঘ্রনন্দনকে দু'হাতে জাপটে ধরে। তারপর তাকে কোলে তুলে নেওয়ার মত ভাবখানা দেখিয়ে সদর্পে ফিরে আসে।

প্রথমেই একটা সদম্ভ উক্তি : জ্যান্ত বাঘ ধরে এনেছি স্যার !

হাণ্টার সাহেব ডবল মার্চ করে এগিয়ে আসেন। ব্যাঘ্রশিশুটির গায়ে হাত দিয়ে অস্পষ্ট কালো দাগগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে থাকেন। তাঁর চোখে

একটা লোলুপ দৃষ্টি, ওটি পেলে যেন কৃতার্থ হন। তাঁর মুখের ভাষা পাঠ করে ভেবে নিলাম, এটা তাঁকে দিলে মন্দ হয় না। হাজার হোক, বিদেশী লোক, তার ওপর ফ্যাক্টর সাহেবের বন্ধু, উপযুক্ত মর্যাদা না দিলে আতিথ্য ধর্মের হানি হয়। তা ছাড়া উপহার দিতে গেলে দেশের সেরা জিনিসটাই দেওয়া উচিত।

ভল্টু হয়ত সহজে রাজী হবে না। তাই কথাটাকে একটু মোচড় দিয়ে বলি—বাঘের বাচ্চা ঘরে পুষতে নেই, শেষে ওই একদিন তোর ছেলেপুলেদের ঘাড় মটকাবে। তার চাইতে যায় শত্রু পরে পরে—ওটা হাণ্টার সাহেবকেই দান কর।

ভল্টুর চোখে নৈরাশ্য, মুখে উদারতার বাণী—বেশ, তাই দিয়ে দিন। কিন্তু, আজ প্রথম দিনেই একটা নয়, দুটো নয়, আড়াইটে শিকার—একি যে সে কথা! আরও নগদ পঞ্চাশটি টাকা আমায় দিতে হবে স্যার!

তিরস্কার না পুরস্কার

অর্জুন সেনের খবর বহুকাল জানি না। ইদানীং অনেকগুলি কাজে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে আমিও 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'। আমার এই স্থাণুত্বে আর কেউ খুশী হোক আর নাই হোক, সব চাইতে আরামে আছেন আমার হাতের পাঁচ ভৃত্যটি। ঘুমুতে পেলে আর কিছু চান না—যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা। অবিশ্যি ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিলেও সুখনিদ্রার ক্ষতিবৃদ্ধি হবে কিনা এখনও পরীক্ষা নেওয়া হয়নি।

বসন্তের ঝিরঝিরে মাতাল হাওয়ার পরমায়ু শেষ। চৈত্রমাসের মাঝামাঝি। এয়ার-কণ্ডিশনিং ঘরের মধ্যে যন্ত্রপাতিগুলো তেল মেখে আবার চকচকে হয়ে উঠেছে। ফ্রিয়ন গ্যাস বুকে পুরে নতুন আবেগে চঞ্চল। গরম এসে পড়েছে। মনে করেছিলাম, মাসখানেকের ছুটি নিয়ে এবার রাজধানীর কাছে কোনো পাহাড়ে চলে

যাব, কিন্তু নতুন একটা কাজে হাত দিয়েছি—শেষ হতে প্রায় মাস তিনেক দেরি; কাজেই যাওয়া হল না।

সকাল বেলায় আমার পড়বার ঘরে কী একটা কাগজ খুলে দেখছিলাম। আজকাল আড্ডা আর তেমন জমে না। মাঝে মাঝে তাস খেলা হয় বটে কিন্তু সেটা প্রায় সাপ্তাহান্তিক হয়েই দাঁড়িয়েছে। এটা গতির যুগ কিনা তাই তাস পাশা খেলা বা আড্ডা দেওয়ার দিকে মানুষের ঝোঁক তেমন নেই, তার চাইতে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে লারেলাপ্পা আর রক-অ্যাণ্ড রোলের হুল্লোড়টাই এখন চলেছে বেশী। পুরনো পাপী দু-চারজন এখনও আছেন—তাঁরাই কালেভদ্রে আসর জমান। বিশেষ করে তাঁদের জন্যেই আমার ঢালা ফরাশটা আজও গুটিয়ে রাখিনি।

বেলা সাড়ে আটটা। একখানা কেতাবের পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় আমার গুণধর ভৃত্যটি সকালবেলার প্রথম কিস্তি ঘুম শেষ করে নিদ্রাবিজড়িত চক্ষে আমার সামনে হাজির। একটা খবর জানিয়ে দিয়েই যেন আর এক দফা ঘুমুতে চান—

—এক সাহেব এসেছে—সঙ্গে বেয়ারা!

—কে সাহেব? সাদা না কালো?

—সাহেবের রং কালো বটে, তবে স্যুট পরা—হাতে হাণ্টার!

—যা, শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়।

মারবেল পাথরে খটমট আওয়াজ তুলে যে সাহেব এসে আমার সামনে দাঁড়ালো তাকে দেখেই অবাক হয়ে গেলাম। অভ্যর্থনা করবো কি, প্রথম দর্শনেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—এ কী, অর্জুন? বহুরূপী কখন থেকে হলে? মুখের এমন চেহারা বানিয়েছ কেন?

ব্যগ্রবাহু বাড়িয়ে বলি—এসো ভাই, এসো—'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে'—তারপর খবর কি? অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে? কী ব্যাপার?

ভৃত্যের প্রস্থান! অর্জুন একবার পেছন ফিরে দেখেই চাপা গলায় বললে—কেন? পছন্দ হচ্ছে না?

—মোটেই না! এ যে আদায় কাঁচকলা। হিটলারী গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট ছুঁচলো দাড়ী—সে যেন নাগা পাহাড়ে গুজরাটি গরবা নাচ! একদম মিশ খায়নি।

—ধীরে বন্ধু, ধীরে! এই হিটলারী গোঁফে মানায় না বলেই তো ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ীর একটা ট্রায়াল দিচ্ছি। পলিটিক্যাল এজেণ্টদের কাজ কিছু থাক আর নাই থাক, জবরদস্ত্ একখানা দেমাক থাকা চাই। কাজেই হিটলারী গোঁফের সঙ্গে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ীর মিতালি। নতুন কিছু একটা করা চাই তো!

—যাকগে এসব গবেষণা। এখন বল দেখি কোথায় ছিলে এতদিন? উঃ, কোন্ লোটাস্ ইটারস্‌দের দেশে গিয়েছিলে, বল তো?

—যা ভাবছ, তা নয়। ছিলাম সেই সুদূর কাছাড় মনিপুর সীমান্তে—নাগা রাজ্যের কাছাকাছি। বছরখানেক সেখানেই কাটলো। বনবাস বা অজ্ঞাতবাসও বলতে পার। তা তোমারও তো দেখছি খুব উন্নতি হয়েছে। দিব্বি নির্জন সাধনায় মেতে আছো। বলি ব্যাপার কি? আড্ডা আসর সব ছেড়ে দিলে না কী?

—আমি না ছাড়লেও ওরাই আমাকে ছেড়েছে। তবে সন্ধের সময় হয়ত দুচারজন আসবে। কই হে ভণ্টু, তোমার মনিবকে ঘরটা দেখিয়ে দাও। তোমার তো সব জানাশোনাই আছে।

বন্ধুবরকে বলি—স্নানাহার সেরে একটু ঘুমিয়ে নাও। আজই তো এলে, ক'দিন নিশ্চয়ই আছো। কথাবার্তা পরে হবে—নতুন দেশের নতুন কথা—

—কথা আর কি ছাই! কাজকর্ম কিছুই নেই। শুধু খাওয়া আর ঘুমনো। ওখানকার লোকদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করা, আর সব চাইতে বড় কাজ হল শিকার। বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিনই যদি শিকার করতে চাও তো জানোয়ারের অভাব হবে না।

—বেশ, তবে আজ সন্ধের সময়ই জোর আসর চলবে। দু-চারজনকে খবর পাঠাচ্ছি।

সেদিন সান্ধ্য আসরের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল বই কি! সপ্তাহান্তে যাঁরা আসেন, তাঁরা তো আছেনই, ক্বচিৎ-কদাচিতের দলে যাঁদের নাম করা যায়, তাঁদের মধ্যেও দু-তিন জন এসেছেন। কিন্তু বহু সাধ্য-সাধনায়ও যাঁকে আমার আড্ডায় টানতে পারিনি, সেই ডাঃ চৌধুরীও এসে হাজির।

—কী ভাগ্যে আজ শিকে ছিঁড়লো! জিজ্ঞেস করতেই তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন—

—না এসে উপায় কী? যা তোমার বিজ্ঞাপনের জোর। অবিশ্যি অর্জুন সেন তোমার বন্ধু হলেও আমার কাছে নেহাত অপরিচিত নয়। আমরা একই ঘরে একসঙ্গে কিছুদিন প্যালেস হোটেলে ছিলাম কিনা!

ঠিক এমনি সময় দিব্যি বাঙালীবাবুর মত ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি আর চপ্পল পায়ে দিয়ে অর্জুন সেনের প্রবেশ। পশ্চাতে ভল্টু।

ডাঃ চৌধুরীর দিকে তাকিয়েই সে বলে উঠল—দিব্যেন্দু না? শুনেছি আজকাল তুমি একজন নামজাদা ডাক্তার!

—নামজাদা না হারামজাদা কে জানে, তবে ডাক্তারি করি বই কি! শুনলাম তুমি নাকি আজ এখানে শিকার সাহিত্যের বৈঠক বসিয়েছ! সাহিত্য-টাহিত্য বুঝি না, তবে তোমার সঙ্গে অ্যাদ্দিন পরে দেখা হবে, সেটাই মস্ত লাভ।

যাঁদের খবর দিয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে একজন সপ্তাহে প্রতি সোমবারে মৌনী থাকেন। ঘটনাচক্রে সেদিনও ছিল সোমবার। এই রত্নবিশেষের নাম অপূর্ব—তাই বুঝি অপূর্ব গাম্ভীর্য নিয়ে সভাস্থলে সমাসীন। তাঁকে দেখলে মনে হয় জীবন থেকে হাসিকে ছেঁটে কেটে একদম বরবাদ করে দিয়েছেন।

চা-পর্ব শুরু হল। অপূর্বর আপত্তি।

আমিও নাছোড়বান্দা। তাকে এককাপ এগিয়ে দিতেই সে তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে খাতা পেনসিল বের করেই কী সব আঁচড় টেনে আমার চোখের সামনে ধরল—রাতে ঘুম হয় না—ওটি অসঝ্য।

বানানের এই অভূতপূর্ব পরিণামে চমকে উঠি—এও কি প্রগতির কবলে? উচ্চারণের সঙ্গে সংগতি রেখেই বানান করতে হবে না কি? তাকে জিজ্ঞেস করি—এ আবার কী?

সে আবার তার খাতায় আঁচড় টানে—শব্দ-শাস্ত্রের নববিধান তৈরী হচ্ছে!

—তা বটে! অপূর্ব দেখছি আমাদের দলে অপূর্ব এগিয়ে আছে।

'চা-পান' শেষ করেই অর্জুন সেন ফরাশের ওপর জুতসই হয়ে বসে বললে:

তাহলে কোন্‌খান থেকে শুরু করা যায়? বেশ, উত্তর কাছাড়ের পাহাড়গুলির কথাই আগে বলি। আমার হেড্‌কোয়ার্টার থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। বসন্ত

সমাগমে স্থানটি ভারী সুন্দর দেখায়। সবুজ ঘাসের ভেলভেট পাতা, এখানে-ওখানে দু-চারটে বড় বড় গাছ। পাহাড়ের মাঝে মাঝে যে ফাঁকা জায়গাগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো ঘাসের জঙ্গল, কোথাও বা দুর্ভেদ্য বেতের ঝোপ। ছোট-ছোট পাহাড়ের ওপরে বাঁশের ঝাড়ও দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো এত ঘন যে মাটির ওপর উপুড় না হলে তার মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে চাষের জমি। ধানক্ষেতে চাষীরা কাজ করে। আশেপাশে ছোট ছোট কয়েকখানা গ্রাম। কিন্তু যে অর্থে আমরা গ্রাম বলে থাকি—সে রকম মানুষের বসবাস নেই—হয়ত বিশ-পঁচিশটি পরিবারে এক একটি বিচ্ছিন্ন বস্তি।

আমার সঙ্গী ভল্টু আর দীক্ষিত। তা ছাড়া পলিটিক্যাল এজেন্সির মাইনে করা জন তিনেক স্থানীয় লোক—চাকর বেয়ারার কাজ করে। রান্নাঘরের চার্জ ভল্টুর ওপর। রন্ধনে দ্রৌপদী—গিন্নিবান্নির কাজ চমৎকার চালিয়ে দেয়।

এখানে আসার পর প্রায়ই সংবাদ পাই—বাঘের বড় অত্যাচার। একদিন একটা জোর খবর এল।

যে লোকটি এসেছিল, তার কাছে শুনলাম, তিন তিনটে বাঘের অত্যাচার! তার মধ্যে একটা নাকি ভীষণ ছিঁচকে আর ভারী হুঁশিয়ার। কিছুতেই ধরা-ছোঁওয়া দেয় না। আশেপাশের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। ক্ষেতে যখন চাষীরা কাজ করে, সে অপেক্ষা করে থাকে, দৈবাৎ যদি কেউ পিছিয়ে পড়ে, তাহলে তার আর রেহাই নেই—বাঘ তাকে উঠিয়ে নেবেই। তাছাড়া হাটের দিন সে চলাপথেই ওত পেতে বসে থাকে। বেলা শেষে, কেনাকাটা সেরে যখন লোকজন বাড়ি ফিরে যায়, তখন পেছন থেকে হঠাৎ কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াই তার কাজ, আর চোখের পলক না ফেলতেই মানুষ নিয়ে উধাও।

এক নিশ্বাসে অনেকগুলি কথা বলে সে তখনও হাঁপাচ্ছিল। গলায় হাত দিয়ে একটু রগড়ে নিয়ে থেমে থেমে বলতে থাকে—আজও এক কাণ্ড! এক চাষী-বউ তার বাচ্চাটাকে নিয়ে ধানক্ষেতে এসেছিল। তাকে একখানা কাঁথার ওপর শুইয়ে সে মাঠের কাজ করতে থাকে। পাশের জঙ্গল থেকে বাঘ চাষী-বউটার ওপর হামলা করে তাকে ঘায়েল করেছে—কিন্তু পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়

বাচ্চাটাকে বোধহয় দেখতে পায়নি। হয়ত খুব কচি বলেই তাকে তাচ্ছিল্য করে ছেড়ে দিয়েছে।

লোকটি আরও বললে—বাঘটা পাকা শয়তান। রাক্ষস যেমন মানুষের গন্ধ পেলে হাঁউমাউখাঁউ করে ছুটে আসে, বাঘটাও তেমনি মানুষ দেখলেই পাগল হয়ে ওঠে। আবার এদিকে এমন হুঁশিয়ার, যদি কোনও বিপদের আভাস পায়, তবে ঘায়েল করা শিকার ফেলে পালিয়ে যেতেও দেরি হয় না।

খুঁটিনাটি তার কাছে জেনে নিয়ে মনঃস্থির করতে বসি। ভল্টু আর দীক্ষিত আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকে। এবার দস্তুরমত লোকজন নিয়ে বাঘের পেছনে লাগতে হবে। বীটার চাই, সাজসরঞ্জাম চাই, আর চাই স্থানীয় দু-একটি বিশ্বস্ত পাকা লোক, যাদের শিকারে অন্ততঃ কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে।

যে লোকটি সংবাদ এনেছিল, আমার প্রস্তাব শুনে সে আ-ভূমি প্রণত হয়ে বললে—তার নাম আও। এর আগেও সে শিকারে গিয়েছে। পূর্বতন পলিটিক্যাল এজেণ্ট হ্যারিংটন সাহেবের সার্টিফিকেটও তার পকেটেই বর্তমান। যদি হুকুম হয়, সে-ই সব কিছুর দায়িত্ব নিতে পারে।

হঠাৎ বাইরে একটা শোরগোল উঠতেই আও ছুটে বেরিয়ে গিয়েই একটা লোক সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। লোকটার দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত হয়ে সে বলতে থাকে—দুশমনটাকে আমি খতম করবই! আমার বাপের জান নিয়েছে বেটা বেইমান!

—কী ব্যাপার? কে তুমি? কোথায় থাক? কী হয়েছে?

জিজ্ঞেস করতেই সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানায়—আমার নাম সবুর। পাশের গাঁয়েই আমরা থাকি। চাষ-বাস করে খাই। গরু, মোষ, লাঙ্গল সবই আছে। আমার বাপজান খুব পাকা শিকারী—এ তল্লাটে সবাই জানে। সাত সাতটা গুণ্ডা বাঘের জান নিয়েছে। আমার বাপজানের এক ডাকে সাত গাঁয়ের লোক জমা হয়—

—বেশ, এখন চট্ করে বল দেখি, ব্যাপারখানা কী?

—বাঘ একটা মেয়েকে খুন করেছে খবর পেয়েই বাপজান দু-তিনটি লোক সঙ্গে নিয়ে সেই মড়ির কাছে সারারাত পাহারা যোগায়। মাঝরাতে বাঘ সেখানে

জানোয়ারটা জখম হয়েও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে···

আসে। বাপজান গাদা বন্দুকের আওয়াজ করতেই বাঘটা পালিয়ে গেল। ভোর-বেলা বাপজান ঘরে ফিরল কিন্তু এমন মনমরা ভাব আমি তার কখনও দেখিনি।

বাইরে একটা গাছের নীচে গাঁয়ের সব লোকজনের জটলা। নানা লোকের নানা মত। বাপজান হঠাৎ সেখানে গিয়ে হুংকার ছাড়ে—বাঘ মারতে যাচ্ছি, কে সঙ্গে আসবি, আয়। লোকের অভাব নেই, অনেকেই যেতে চাইল। পাঁচজন লোক বেছে নিয়ে সেই বাঘের আড্ডায় হানা দিতেই ওই শয়তানটা বেরিয়ে আসে। বাপজানও সঙ্গে সঙ্গেই গুলি চালায়। জানোয়ারটা জখম হয়েও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর এক থাবায় ঘাড় মটকে ছুটে পালিয়ে যায়। বাপজানের গুলিতে ব্যাটা খোঁড়া হয়েছে বটে, কিন্তু তার শয়তানি যেন আরও দশগুণ বেড়ে গিয়েছে। এটাকে খতম করা চাই-ই চাই।

ভীষণ গর্জন করে একটা বাঘ শূন্যে লাফিয়ে উঠে

পৃঃ ৩৮

বুঝলাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সে বদ্ধপরিকর।

সবুরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি—একটু সবুর কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে আর দেরি নেই। তোমার বাপের মস্তকচর্বণের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

আওকে ঢালা হুকুম দিলাম—চলা আও! শিকারের সব রকম বন্দোবস্ত কর, যাতে কাল ভোরেই আমরা বাঘের রাজ্যে হানা দিতে পারি।

সবুরও প্রতিশ্রুতি দিল অন্ততঃ এক কুড়ি বাছা বাছা তাগড়া লোক নিয়ে সে অতি প্রত্যুষেই হাজির হবে।

রাত্রে খাবার টেবিলে আমি আর দীক্ষিত পরদিনের শিকারের আলোচনায় মেতে উঠলাম। দীক্ষিত বলতে চায়—পায়ে হেঁটে শিকার করতে যাওয়ার দায়িত্ব খুব বেশী। হাতি পাওয়া গেলে অনেক সুবিধে। তাছাড়া যদিও লোকবল নেহাত কম হবে না, তাহলেও জঙ্গল 'বীট' কী ভাবে হবে আর কোথায় কী ভাবেই বা আমরা তৈরী থাকব সে সম্বন্ধে একটা প্রোগ্রাম ঠিক করা উচিত।

রান্নাঘর থেকে ভল্টু নিজের হাতে তৈরি করা খাবার আনতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দীক্ষিতের শেষ কথাটি শুনতে পেয়েই গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে উত্তর দেয়—সেটা আর বলতে হবে না, ও তো ছককাটাই আছে—আমি আর সাহেব এক সঙ্গেই থাকবো বরাবর। আপনাকে কোনও আগের ঘাঁটিতে থাকতে হবে। আও জঙ্গল বীটারের দলকে সামলাবে—সবুর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

দীক্ষিতের কম্পিত উচ্চারণ—আমি কি একলা থাকবো না কি? ওরে ব্বাবাঃ!

তাকে সাহস দিয়ে বলি—কুছ্ পরোয়া নাই! তোমাকে কোনও গাছের ওপর তুলে দেব। তোমার কাজ হবে শুধু নজর রাখা—আর ভল্টু, আমাদের ডান হাতের যোগাড় যেন সব তৈরী থাকে।

—সে আর দেখতে হবে না।

পরদিন।

ভোরেই আমাদের গেটের বাইরে বেশকিছু লোক সমাগম হয়েছে। বের হয়ে দেখি, আও তার দলবল নিয়ে হাজির—ত্রিশজনের কম হবে না, ইয়া গাঁট্টাগোট্টা

ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের চেহারা। দেখে মনে হয়, হ্যাঁ, এরাই পারে এক থাবড়ায় বাঘকে শুইয়ে দিতে। প্রত্যেকের হাতে লাঠি আর কোমরে দোদুল্যমান খড়্গ।

আওকে কিছু বলার আগেই দেখা গেল দ্বিতীয় আর একটি দল এগিয়ে আসছে। দলপতি সেই সবুর যার বাপজান সদ্য বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে। সে এসেই তার সাঙ্গোপাঙ্গদের মিলিটারী কায়দায় দাঁড় করিয়ে দিলে।

আমরাও তৈরী হয়েই ছিলাম। আমাদের তিনজনের হাতেই তিনটে বন্দুক। প্রত্যেকের কাছেই গুলি ভরতি বেল্ট। ভল্টু উপরন্তু একটা ভোজালি নিয়েছে। প্রত্যেকের মাথায় লোহার টুপি।

আমরা রওনা হলাম। প্রথমে একটা মাঠ পার হয়ে একটি বস্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় সবুর বললে—পাশের গাঁয়েই আমার ঘর। বাঘটা ওই দূরের পাহাড় থেকে নেমে এসে নদীর ধারের জঙ্গলে আস্তানা নিয়েছে। চাষী-বউটাকে ধানক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে ওই জঙ্গলেই ঢুকে পড়েছে নিশ্চয়।

আও বীরদর্পে তার বীটার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেল। আমরা গ্রামের প্রান্তে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকি। আও-এর নির্দেশ, সে সামনের জঙ্গলটাকে পেছন দিক থেকে ঘেরাও করে বীট্ চালাবে। এদিক থেকে সবুর আমাদের নিয়ে সামনাসামনি জঙ্গলে ঢুকবে। যে দলই বাঘ দেখতে পাক' না কেন, সেটাকে তাড়িয়ে শিকারীর সামনে ফেলে দেওয়া চাই-ই চাই। যদিই কোনরকমে মহাপ্রভু জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে যান, তাহলে তিনি ওই পাহাড়ে উঠেই নাগালের বাইরে চলে যাবেন।

সবুরের আর সবুর সয় না। সে যেন বাঘটাকে পেয়েছে—তাকে খতম করতেই যা বাকী। তার যমদূতের মত শাগরেদের দল নিয়ে বীরদর্পে সে এগিয়ে গেল। আমরাও তার অনুসরণ করি। একটি ছোট্ট পার্বত্য নদী জঙ্গলটাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘেরাও করে এক পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। সে সময় জল নেই বললেই হয়। স্থানে স্থানে শুক্‌নো, হয়ত কোথাও একটু জল জমে আছে, কোনো জায়গায় বালির ওপর ছোট ছোট ঝোপ, কোথাও বা বেতের জঙ্গল।

আমরাও সেই জঙ্গলে ঢুকে পড়ি।

দীক্ষিত মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়ায়—তার পা যেন চলতে চায় না। ভাব-

গতিক দেখে তাকে একটা গাছে তুলে দিলাম। ভাল করে এই কথাটা তার মগজে ঢুকিয়ে দিই যে, কোনও অবস্থাতেই সে যেন গুলি না ছোড়ে। যদি বাঘটা একান্তই এদিক দিয়ে ছুটে যায়, তাহলে যেন চিৎকার করে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

আমি আর ভল্টু জঙ্গলের মধ্যে নিঃশব্দে এগোতে থাকি—সবুর তার দলবল নিয়ে আমাদের প্রায় বিশ গজ আগে। এমন সময় জঙ্গলের অপর প্রান্ত থেকে ভীষণ একটা হইহল্লা শুরু হয়। এদিকে সবুরের সঙ্গীরাও গাছে গাছে ঠক্ ঠকাঠক্ করে ক্রমাগত লাঠির আওয়াজ করতে থাকে।

হঠাৎ দুটো লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, নদীর পাশেই একটা ঘন ঝোপের আড়ালে তারা বাঘের লেজ দোলানো দেখতে পেয়েছে। বীটাররাও ততক্ষণে আমাদের কাছেই এসে পড়েছে। তাদের সবাইকে কিছুটা দূরে দূরে দাঁড় করিয়ে দিলাম। গাছের ওপরও কয়েকজনকে তুলে দেওয়া হল। সবাইকে সাবধান করে দিই যেন কেউ জঙ্গলের ভেতর ঢুকে না পড়ে।

অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি—বাঘের সাড়া-শব্দ নেই। ভেলকি নাকি? কোথায় গেল?

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না—হঠাৎ একটা ক্ষুব্ধ গর্জন। তার বনরাজ্যে অবৈধ প্রবেশের শাসনকল্পে যেন এই হুকুমনামা!

কিন্তু আমাদেরই ভুল। বাঘ যে পাক্কা সেয়ানা, তার পরিচয় অনতিকালের মধ্যেই পাওয়া গেল। চোরের মত পা টিপে টিপে সেই জানোয়ার ঘন ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়েই সাঁ করে নদীর খাতের ভেতরে একটা বেতের জঙ্গলে ঢুকে পড়লো—যেন পালিয়ে বাঁচতে চায়।

এই পর্যন্ত বলেই একটা বাধা পেয়ে অর্জুন চুপ করে গেল। একঘর লোক গল্প শুনছে, নিশ্বাস ফেলার শব্দটিও শোনা যায় না, এরই মধ্যে আমাদের মৌনী মহারাজ তাঁর নোটবুকে আবার কী একটা লিখে আমার সামনে ধরলে।

আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা—প্রকৃতির ডাকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আর বসার উপায় নেই—বিদায়!

অর্জুন সেনের বক্রদৃষ্টি, কণ্ঠস্বরে তরল পরিহাস—তার আবেদন তখনি মঞ্জুর

করে—বাঘের নাম শুনেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য? দেখলে না জানি কী—! তা, যান, যান, আর দেরি করে কাজ নেই। প্রকৃতির ডাকই মোক্ষম ডাক্, সাড়া না দিলে কেলেঙ্কারি হতে কতক্ষণ?

ওদিকে অপূর্ববাবু বেজায় কাবু হয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। এদিকে আমিও বুঝলাম, তাঁর স্ব-কল্পিত অভিধান থেকে হ-এ য-ফলা চিরবিদায় নিয়েছে।

অর্জুন সেন আবার শুরু করে দেয়ঃ

—আওকে ডেকে বলি, বাঘটাকে বেতের জঙ্গল থেকে বের না করলে কিচ্ছু উপায় নেই।

তাকে প্রাধান্য দেওয়ায় সবুর ক্ষুণ্ণ—তাই সবুর না করে দ্বিগুণ উৎসাহে তার দলবল নিয়ে বেতের জঙ্গলে হানা দিতে চাইলে।

ভল্টু তাকে হুঁশিয়ার করে দেয়—খবরদার, ওসব হানাটানা একদম মানা। জানা গেল তোমার সব কেরামতি। তার বদলে এক কাজ কর, সবাই এক এক গাছে উঠে পড় আর চিৎকার জুড়ে দাও—দেখি ব্যাটা বেরিয়ে আসে কি না!

এ ব্যবস্থা মন্দের ভাল। এই ধরনের শিকারে হাতি থাকলে অনেক সুবিধে, কিংবা মাচান বেঁধেও কাজ হয়। দুটোর কোনটাই যখন নেই, আমাদের একটু অতিরিক্ত সাবধান হতে হবে বই কি!

আমি আর ভল্টু খুব কাছাকাছি সেই পাহাড়ী নদীর ধারে একটা গাছে উঠে পড়ি। আও, সবুর ও অন্যান্য বীটাররাও বেতঝোপটাকে ঘিরে এক একটা গাছে আশ্রয় নিল—তারপরই একটানা হইচই আর ডামাডোল।

আমি যে ডালে বসে আছি, তারও বেশ কিছুটা ওপরের ডালে পৌঁছে ভল্টু আমাকে ইশারায় তার কাছে উঠে আসতে বললে। গিয়ে দেখি বড় একটা কেঁদো রয়েল টাইগার সামনের দুটো পা ছড়িয়ে রাজকীয় কায়দায় আমাদের সামনেই বসে আছে। দেখে মনে হয়, ডোণ্ট কেয়ার ভাব—কারো পরোয়া করে না।

বেত-জঙ্গলের বিশেষত্ব এই যে, মাটি থেকে দেখা যায় না, কিন্তু ওপর থেকে ভেতরটা বেশ নজরে আসে।

হাঁড়ির মত সম্পূর্ণ মাথাটা পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ গুলি আর তখনি কাত—কোনও শব্দ বা গর্জন কিছুই শুনলাম না। এরকম সচরাচর হয় না।

গুলির আওয়াজ পেয়েই আর একটি বাঘ হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। আমিও গুলি করলাম, কিন্তু ডাল থেকে টাল খেয়ে পড়ে গেলাম। তাল সামলাতে পারিনি। বুঝলাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। তারপর কী হল, ভল্টুর মুখেই শোনো।

এতক্ষণ ভল্টু ছিল নীরব শ্রোতা; এবার সোজা দাঁড়িয়ে সে বলতে থাকে—আচমকা সাহেব পড়ে যেতেই আমি একদম নার্ভাস হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে পড়তেই দেখি আও, সবুর ও তার দলবল ছুটে এসেছে। বন্দুকের দু-দুটো গুলির আওয়াজ তারা শুনেছে—সাহেবের পড়ে যাওয়াটাও তাদের নজর এড়ায়নি।

বেতের জঙ্গল যেন একখানা স্প্রিং দেওয়া খাট—সাহেবকে হাত বাড়িয়ে লুফে নিলে। মাথায় লোহার হেলমেট আর গায়ে চামড়ার পোশাক ছিল কিনা, তাই বিশেষ কিছু হয়নি। ভগবান রক্ষে করেছেন।

তবু বেতের কাঁটার প্রেম তো সোজা নয়, বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। কোনো রকমে ঝোপের বাইরে আসতেই সাহেবকে জিজ্ঞেস করি—খুব কি লেগেছে?

কোনও উত্তর পেলাম না। যে বাঘটা একগুলিতেই খতম হয়েছে, সেটা বের করে আনার জন্য আওকে নির্দেশ দিয়ে সাহেব সবুরকে জিজ্ঞেস করলেন—কী হে সবুর, দেখতো এটাই তোমার বাপজানের জান নিয়েছে কিনা?

সবুরও তখনি জবাব দেয়—না হুজুর, সে ব্যাটা ছিঁচকে চোর, আমার বাপ-জানের গুলি খেয়ে আরও চালাক হয়ে উঠেছে। এত শিগগির ধরা দেবে না।

এমন সময় আও আর তার দলবল বাঘটাকে চ্যাংদোলা করে বাইরে আনতেই সে একবার পরখ করে নিলে। আমরাও দেখলাম, সাহেবের মোক্ষম গুলি বাঘের কপাল ফুটো করে ঘাড় ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছে, আর তাতেই ব্যাটা কুপোকাত।

অর্জুন যেন ভল্টুকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই গল্পের খেই ধরে:

—এখন আমাদের কাজ হল দুনম্বর বাঘের পেছনে ধাওয়া করা। কিন্তু সেটা যে কোন্ দিকে কোন্ জঙ্গলে ঢুকেছে তা লক্ষ্য করা হয়নি। ঠিক এমনি সময় দীক্ষিতের উদাত্ত আহ্বান—বাঘ, বাঘ—এই দিকে—নদীর খাতের মধ্যে ওই ঝোপে—

বন্ধুবরের ধৈর্যের তারিফ করতে হয়।

সন্তনিহত বাঘকে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আওএর ওপর জারি করে আমি ভল্টু আর সবুর ও তার বাছা বাছা গুটিকয়েক শাগরেদকে সঙ্গে নিয়ে তখনি রওনা হলাম। দীক্ষিতকেও গাছ থেকে নামতে বলি। সে এসে যোগ দিতেই আমরা নদীর খাতে নেমে পড়লাম।

দীক্ষিতের দ্বিধাবিজড়িত কণ্ঠ—বাঘটা খোঁড়া নাকি? একটা ঠ্যাং উঁচু করে তিন পায়ে ছুটে পালালো!

সবুর হাততালি দিয়ে ওঠে—এই ব্যাটাই নির্ঘাৎ সেই বাঘ, তার বাপজানের গুলিতেই খোঁড়া হয়েছে। আল্লার দোহাই, ওর জান নিতেই হবে।

দীক্ষিতের নির্দিষ্ট সেই ঝোপের কাছাকাছি যেতেই আমাদের সামনে আর একটা ছোট্ট ঝোপ, তারই ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সেই শয়তান বাঘটা পেটের ওপর ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসে, যেন তার মতলবখানা এই যে আমরা তাকে দেখবার আগেই সে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বাঘের এই রুদ্ররূপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দূর থেকে বিস্তর দেখেছি, কিন্তু এমন সামনাসামনি আর এই খোলা জায়গায়!

আমার সামনে শুধু ওই বাঘ আর এদিকে আমি—আর কোনও হুঁশ ছিল না। আমার বন্দুক এবার আমার সঙ্গে এক মন এক প্রাণ।

সেই নরখাদক বাঘ গলা উঁচু করে আমাদের চ্যালেঞ্জ করার মুহূর্তেই আমার বন্দুক গর্জে উঠলো। গুলিটা লাগলো বাঘের গলায়, যে গলা দিয়ে সবুরের বাপজানের মত কত মানুষ তার পেটের মধ্যে চলে গিয়েছে। সেই ব্যাঘ্রবিক্রম শেষবারের মত একটা বিরাট লাফ দিয়েই ঘুরে পাশের একটা ছোট্ট নালায় গড়িয়ে পড়ল। একবার মাথা তুলতে চাইল বটে, কিন্তু পর মুহূর্তেই তার মস্তক ঝুলে পড়ল—হাত-পা ছড়িয়ে জানিয়ে দিলো, সে তার আজীবন কৃতকর্মের মাশুল দিয়ে বিদায় নিয়েছে।

প্রতিজ্ঞা পূরণ করা চাই তো!

সবুর হঠাৎ যেন খেপে ওঠে। মরা বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। কত বাধা দিলাম, কত তিরস্কার করি,

মরা বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই··· [পৃঃ ৭০

ভ্রুক্ষেপ নেই। শেষটায় ভল্টু তার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসে, আর এমন সুন্দর চামড়াখানা নষ্ট করার জন্যে অজস্র গালাগাল দিতে থাকে। দীক্ষিতও তার সঙ্গে সমানতালে যোগ দেয়। শিকারে দীক্ষিতের দীক্ষা বা শিক্ষা না থাকলেও ওই চামড়াটি ভিক্ষা চাইবার একটা গুপ্ত বাসনা অন্তরে ছিল বই কি! তাই গালমন্দ করতে গিয়ে তার কণ্ঠ যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

তবুও সবুর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ সে তৃপ্ত। পিতৃহত্যার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিয়ে এত তিরস্কারের মধ্যেও সে আজ পেয়েছে যেন তার চরম পুরস্কার।

শিকার নয় অস্বীকার

দশটা-পাঁচটা অফিসের মত কাজকর্ম কোনদিনই ভাল লাগে না। সাধ্যমত সেদিকটা এড়িয়ে চলতে চাই। তবু 'কম্‌লি ছোড়তা নেহি'—আমাদের বহুকালের পুরানো ম্যানেজার ভরদুপুরে আমার আরামবাগে হানা দিলেন—উদ্দেশ্য নতুন জলকর বন্দোবস্তের দলিলখানা আমাকে শুনিয়ে দস্তখত করিয়ে নেবেন।

অলস মধ্যাহ্নের ঝিমিয়ে পড়া ভাব মুহূর্তে কেটে গেল। একপাশে আমার অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা এতক্ষণ চিত হয়ে মাছি তাড়াচ্ছিল, সেও উঠে সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে। আমিও আড়মোড়া ভেঙে ম্যানেজারকে আহ্বান করি—আসুন, কাজটা শেষ করে দিই।

দলিলটা নিয়ে পাতায় পাতায় সই করে দিলাম। ম্যানেজারবাবু কলমটা পকেটে রেখে দলিলখানা পড়তে শুরু করেন। তাঁর একঘেয়ে অনুনাসিক স্বরে প্রাণ অতিষ্ঠ। সমস্তটা শোনা শেষ হয়েছে, এমন সময় আমার নতুন নেপালী দারোয়ানের বুটের আওয়াজ।

আবার কে এলো? জিজ্ঞেস করতেই লম্বা একটা সেলাম ঠুকে সে জানায় —মিলিটি্র সাহাব!

ম্যানেজারবাবুকে বলি—এবার আপনি আসুন।

বাইরে বারান্দায় আসতেই দেখি, দেউড়ির সামনে বন্ধুবর মেজর অর্জুন সেন, আমার পিসতুতো ভাই নীরেনের সঙ্গে আলাপে মত্ত।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাই। নীরেনকে ভৎর্সনা করে বলি —বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছো কেন? ওপরে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

নীরেন সর্বদাই সপ্রতিভ, সটান কৈফিয়ত দিলে—কী করবো বল, তুমি যে রাজকার্যে ব্যস্ত! এইমাত্র ম্যানেজারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

—ওসব নীরস গদ্য আমার কোনদিনই ভাল লাগে না, তারপর সেন, কোনও খোঁজখবর নেই—এমন অসময়ে হঠাৎ?

—আমার আবার সময় অসময় কী? এলেই হল। আর এ সময়টা যে তুমি শিকার ছেড়ে কোথাও যাবে না, সেটা হলফ করেই বলা যায়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকি, আর তার কথার জবাব দিয়ে যাই— তা যা বলেছ ভাই! শীতের মরশুমটা আমি বিশেষ কোথাও যাই না। পদ্মার চর রোজই আমাকে ডাকে—নানা রকমের অগুনতি পাখির মেলা। তা ছাড়া ধারেকাছের জঙ্গলে বড় শিকারের খোঁজও যে না থাকে, এমন নয়; তাই ঘটা করে প্রতিবছর দূরের জঙ্গলে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার বিলাসিতাটা আমার পোষায় না।

নীরেন প্রতিবাদ করে—কেন দাদা, উড়িষ্যা, হাজারীবাগ, ডুয়ার্স, আসামের জঙ্গল—কোন্‌টা তুমি বাদ রেখেছ?

অর্জুন সেন হোহো করে হেসে উঠেই চিমটি কাটলে—আপনার দাদাটি যে

বর্ণচোরা আম! নিজের কথা বেমালুম চেপে গিয়ে আমার পেটে খোঁচা দিয়ে সব কিছু বের করে নিতে চায়। ও কি কম ফন্দীবাজ!

বাধা দিয়ে বলি—এসব ক্ষ্যামা দাও। তোমার স্নানাহার নিশ্চয়ই হয়নি। আগে সেই ব্যবস্থা করি—তারপর সান্ধ্য আসরে তোমার ঝুলি হাতড়ে দেখব—নতুন চিজ কী এনেছ।

আমার বৈঠকখানা ঘরটির বেশ সুনাম আছে। লোকজনের অভাব হয় না। তাস-পাশাও খেলা হয় আবার কোনোদিন সাহিত্যের আসরও জমজমাট হয়ে ওঠে। অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি, নীরেন যথারীতি হাজির। তাস-পাশা খেলায় যাঁদের অনুরাগ, তাঁরাও এসেছেন বটে, কিন্তু বন্ধুবরকে আমার সঙ্গে ফরাশে বসে পড়তে দেখেই তাঁরা কেটে পড়ার তালে আছেন।

তাঁদের ভাবগতিক লক্ষ্য করে আমি চায়ের ফরমাশ দিলাম। ইত্যবসরে অর্জুনকে প্রশ্ন করি—সেন, প্রতিবারই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তুমি এড়িয়ে যাও। তোমার আদি ও অকৃত্রিম শিকারের গল্পটি আজ শোনাতে হবে। কেমন, রাজী?

অর্জুন একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, তারপর যেন কোন্ গভীর থেকে তার নিরুৎসাহ কণ্ঠ বেজে ওঠে—আমার প্রথম শিকার? আদি ও অকৃত্রিম? হ্যাঁ, তাই বটে!

বন্ধুর চোখে কেমন একটা বিষণ্ণ ছোঁয়া—মুখখানা থমথমে ভারী হয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি বলতে যাই—যদি কোনও অসুবিধে থাকে, তবে না হয় থাক।

অর্জুন সেনের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ—তবে শোনো। বড্ড করুণ আর বড়ই মর্মান্তিক। তাই এই শিকারকে চিরদিন অস্বীকার করে এসেছি।

সবে কুড়ির কোঠায় পা দিয়েছি। বি. এস্-সি. পরীক্ষার পর কিছুদিনের জন্যে অন্য কোথাও কেটে পড়ার তালে আছি, এমন সময় মার চিঠি পেলাম। আমাকে যেতে হবে ডুয়ার্সের জঙ্গলে, আমার দিদির কাছে। তাঁর স্বামী মিঃ পরেশ গুপ্ত

সেখানকার ফরেস্টের রেঞ্জার। দিদির শরীর ভাল নয়—তাই তাঁকে নিয়ে আসার জন্যেই আমার তলব।

অতএব যেতে হল ডুয়ার্সে। পথের কষ্ট যা ছিল তার চাইতে অনেক বেশী আনন্দ পেলাম সেই পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। চোখে না দেখলে কথায় ঠিক বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন। তিস্তা নদীর ধার দিয়ে যখন যাই, কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন পথ দেখিয়ে চলে। ভুটানের পাহাড় থেকে নদীগুলি এঁকেবেঁকে নেমে সমতলের ওপর হঠাৎ নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। সে দৃশ্য ভোলা যায় না।

বেলা এগারোটায় ফরেস্ট অফিসের বাংলোয় পৌঁছেই দেখি আমার দিদি যেন আমারই প্রতীক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে। ভগ্নীপতির খোঁজ করতেই শুনি, তিনি কাজে বেরিয়েছেন, ফিরতে বিকেল হবে।

কিছুটা বিশ্রাম করে নেওয়া গেল। দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় একটি নেপালী সর্দার এসে দিদিকে সাবধান করে গেল—খুব হুঁশিয়ার, বাঘ বেরিয়েছে !

খবরটা শুনেই চমকে উঠলাম—জলজ্যান্ত বাঘ ! জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? এ দৃশ্য যে না দেখলেই নয় !

দিদিকে সে কথা জানাতেই তিনি যেন আঁতকে উঠলেন—না রে বাপু, তোর জামাইবাবু আসুন, তারপর যেখানে হয় তাঁর সঙ্গে যাস।

অগত্যা অপেক্ষা করি। বেলা চারটের সময় ভগ্নীপতি ফিরে এলেন—সঙ্গে আট দশ জন লোক। প্রত্যেকের হাতেই বল্লম। জামাইবাবুর হাতে রাইফেল, কোমরে রিভলভার। ফরেস্টে কাজ করতে গেলে রীতিমত তৈরী হয়েই জঙ্গলে বেরুতে হয়।

ফরেস্ট অফিসের আশেপাশেই কয়েকখানি বাংলো। সবই উঁচুতে—কাঠের পাটাতনের ওপর ঘর, নীচেটা ফাঁকা। অধিবাসীরা বেশীর ভাগই নেপালী। কিছু দেশীয় লোকও আছে। সন্ধ্যার আগেই যে যার ঘরে আশ্রয় নিলে। বাঘের খবরটা ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছে। তাই সবার মুখেই একটা উত্তেজনা আর সতর্কতার ছাপ।

অনেকদিন পর আমাকে কাছে পেয়ে জামাইবাবুর আনন্দ আর ধরে না। তবু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন—কী যে চাকরি করি, কোনও আত্মীয়স্বজনের মুখ দেখার উপায় নেই। কী করবো, জানোই তো ভাই, পেটের দায় বড় দায়! ভালোও লাগে না ছাই! এদিকে তোমার দিদি প্রায়ই তাঁর পিত্রালয়ে যাবার নোটিস দেন। আমিও ঠিক করে ফেললাম, যাক না, ক'দিন ঘুরে আসুক। এই উপলক্ষে তোমাকে যে দেখতে পেলাম এই আমার মস্ত লাভ।

অত্যুগ্র বাসনা নিয়ে নীরেন কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, অর্জুন সেন আঙুল ঘুরিয়ে তাকে থামিয়ে দেয়।

—এইবার আসল কথায় আসি। জামাইবাবুর কাছে সটান প্রস্তাব করে ফেললাম—আমি বাঘ শিকার করব।

তিনি একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন—এ কি তোমার হোগলা বনের বনবেড়াল নাকি? বন্দুক ধরতে জানো?

পৌরুষে আঘাত লাগল। না হয় বনেজঙ্গলেই থাকার সুবিধে নেই, তাই বলে বন্দুক ধরতে জানি না, এই অপবাদ সইব কেন? দস্তুরমত বুক ফুলিয়ে বলি—সে আর বলতে হবে না স্যার, আমার নিজস্ব গ্রীনার আছে, রাইফেলও আছে। ঢের ঢের শিকার করেছি, পাখি থেকে শুরু করে, শুয়োর, কুমির, ইস্তক একটা লেপার্ডও মেরেছি, তা জানেন?

দিদিও আমাকে সমর্থন করেন—তুমি জানো না, অর্জুন দুহাতে বন্দুক ছুঁড়তে পারে···সত্যিকার সব্যসাচী। ওকে আমি বাঁ হাতে পাখি মারতে দেখেছি।

গৃহকর্তা তখন মাথা চুলকে বললেন—তাই তো, এখন দেখছি বড় কুটুমের আবদার উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এই জঙ্গলে বাঘ শিকারের আয়োজন করাও যে বিষম ঝামেলা। কোথায় বা লোকজন···আচ্ছা দেখি, কী করা যায়! অস্ত্রের মধ্যে সম্বল তো আমার ওই রাইফেল, আর এই রিভলভার।

রাতটা কোনোরকমে কেটে গেল। হঠাৎ একটা আওয়াজে প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি ফরেস্ট অফিসের সামনে বেশ কিছু লোক জমা হয়েছে, আর তারাই শোরগোল তুলেছে।

ব্যাপার কী?

ব্যাপার গুরুতর। বাড়ির নেপালী চাকরটা ছুটে এসে জানালো, কাল রাত্রে খড়গ বাহাদুরের জেনানাকে বাঘে নিয়েছে। বাইরে বেরিয়েছিল, এমন সময় বাঘটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে চিৎকার করে ওঠে। শুনলাম, খড়গ বাহাদুরও তার খড়গ অর্থাৎ ভোজালি নিয়ে ছুটে যায় কিন্তু তার ছোরার ঘা খেয়েও বাঘটা দমেনি বরং এক থাবায় তাকেও ঘায়েল করে পালিয়েছে। জেনানাটা বোধহয় মরেই গিয়েছে, খড়গ বাহাদুরের অবস্থাও খুব খারাপ।

খবর পেয়েই গুপ্ত সাহেব ছুটে গেলেন; আবার অল্পক্ষণ পরেই তেমনি ছুটে এসে বললেন—শিগগির চায়ের ব্যবস্থা কর; এখুনি বেরোতে হবে।

দিদি প্রশ্ন করেন—লাফিয়ে তো উঠলে, ফিরবে কখন?

—সেটা কী করে বলি? এক সময়ে নিশ্চয়ই ফিরে আসব।

—অর্জুন কিন্তু যাবে না!

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি।

—সে কি দিদি, এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও যদি হাতছাড়া করি, জন্মের মত একটা আফসোস থেকে যাবে যে!

গুপ্ত সাহেব আমার হাত ধরে তুলে বললেন—চিয়ার আপ্ বয়! কুছ পরোয়া নাই, তুমিও সঙ্গে যাবে। চটপট তৈরী হয়ে নাও।

ভাগ্যক্রমে একটা খাকী প্যান্ট আর শার্ট সঙ্গেই ছিল, আমার এন. সি. সি. ট্রেনিং-এর পোশাক। তৈরী হয়ে নিতে বেশী দেরি হল না। আমরা সেই ফরেস্ট অফিসের সামনে হাজির হলাম। জামাইবাবুর হাতে রাইফেল, কাঁধে বুলেটের ব্যাগ। আমার কোমরে রিভলভারের পেটি।

খবরটা এখানেই ভাল করে শোনা গেল। জোয়ান খড়গ সিং ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের ওয়ার্ডার, সস্ত্রীক থাকে। সেদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় স্ত্রী বেচারী ওপর থেকে নীচে নেমেছে কোনও একটা জরুরী দরকারে, হঠাৎ একটা বাঘ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে আর্তনাদ করে ওঠে। খড়গ বাহাদুর তখন ঘরে বসে তার ভোজালিতে শান দিচ্ছিল, স্ত্রীর চিৎকার শুনেই সে বেরিয়ে আসে আর অস্পষ্ট আলোকে সেই বাঘটাকে তার স্ত্রীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে দেখে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার তর সয়নি, লাফিয়ে নীচে পড়েই বাঘটাকে আক্রমণ করে। খড়গ বাহাদুর খড়েগর আঘাত করতেই বাঘটা থাবার এক ঘায়ে তাকে উলটে দিয়েই চম্পট। তার স্ত্রী মরে গিয়েছে, সে নিজেও বাঁচে কিনা সন্দেহ।

ফরেস্ট অফিসের হেডক্লার্কের ওপর যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়ে গুপ্ত সাহেব রক্ষীদলের সর্দারকে জিজ্ঞেস করলেন—বাঘটা কোন্ দিকে পালালো? খুঁজে বের কর, ইনাম পাবে।

সর্দারের নাম টিক বাহাদুর। একপাশে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

গুপ্ত সাহেব পরিষ্কার হিন্দীতে বুঝিয়ে দিলেন—গার্ড লাইনের বাছা বাছা জন দশেক লোক এক্ষুনি যোগাড় কর—প্রত্যেকের হাতে লাঠি বল্লম থাকা চাই।

মাত্র দশ বারোজন লোক নিয়ে খুনে বাঘের সামনে যাওয়া চলে না। তাই নেপালী বস্তিতে গিয়ে আরও বেশী লোক সংগ্রহ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির।

লোকজনের সমাবেশ দেখে গুপ্ত সাহেব বললেন—যাক, এবার জঙ্গলটা বীট করতে আর অসুবিধে নেই। সর্দার টিক বাহাদুরের সর্দারি—হুজুর, নদীর ধার দিয়ে আমরা জঙ্গলটা ঘেরাও করতে চাই। আপনারা এদিক থেকে এগিয়ে চলুন।

পাগলী নদী—শুধু নামেই নয়, কাজেও। ভুটানের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। বর্ষার জলধারা উন্মাদিনী হয়ে ছুটে আসে, আবার শরৎকালেই তার বুকে জল থাকে না। কোথাও বা সামান্য স্রোতের রেখা দেখা যায়। তারই পাশে পাশে জঙ্গল। আমরা যেখানে ছিলাম, তার থেকে বেশী দূর নয়, আধ মাইল।

হঠাৎ বাঘটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই:··· [পৃঃ ৭৮

টিক বাহাদুর তার দলবলকে নদীর ধার দিয়ে জঙ্গলটা ঘেরাও করে বীট করার নির্দেশ দিলে। তারপরই বাছা বাছা সাতজন গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে চলে। কিছুটা দূর যেতেই একটা ফাঁকা ফালির মত জায়গা পাওয়া গেল। সেটা পার হয়ে সামনের জঙ্গলে ঢুকেই কয়েকটা শালগাছের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীটাররা হইচই করে জঙ্গল বীট শুরু করে দেয়। তাদের সমবেত চিৎকারে মনে হল যেন বনের মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্র বেধে গিয়েছে। বাঘটা যদি এদ্দিকে এসে থাকে, নির্ঘাত আমাদের সামনে তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

গুপ্ত সাহেব টিক বাহাদুরকে বলেন—কীরে, বাঘ এদিকেই এসেছে তো? তুই জানলি কী করে?

টিক বাহাদুরের মুখে একটা ম্লান হাসি, টিকটিক করে উত্তর দেয়—হুজুর, আমরা পাহাড়ী জাত, জঙ্গলের নাড়ীনক্ষত্র আমাদের চেনা। বনের রাজা বাঘ যে কোন্ দিকে কখন থাকে, আমরা তার গন্ধ পাই।

হঠাৎ গুপ্ত সাহেব রাইফেলটা আমার হাতে দিয়ে রিভলভারের পেটি আমার কোমর থেকে খুলে নিজের কোমরে বেঁধে নিলেন। তারপর আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। টিক বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সময় হুকুম দিলেন—খুব সাবধান, রেডি থাকবে, আমি সামান্য একটু এগিয়ে যাই, হালচালটা একবার দেখে নিই।

আমিও রাইফেলটা নেড়েচেড়ে দেখি।

এদিককার বনজঙ্গল আমাদের দেশের মত নয়, এর জাতই আলাদা। দাঁড়িয়ে দিগন্তজোড়া সেই শ্যামল বনানীর সৌন্দর্য দেখছিলাম, আচমকা একটা গর্জন শুনেই আড়াল থেকে বেরিয়ে যা দেখলাম—গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

প্রায় বিশ গজ দূরে জামাইবাবু ভূলুণ্ঠিত—বাঘ তাঁর ওপরে।

এ কী কাণ্ড!

মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল।

জামাইবাবুকে বাঁচাতে হবে! নিজের অজ্ঞাতসারেই বন্দুকটি উঠিয়ে ট্রিগার টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ডোরাকাটা গুণ্ডা বাঘ একটা বিকট হুংকার ছেড়ে মাটির ওপর নেতিয়ে পড়ল। আর এক গুলি!

ব্যস্—খতম্!

ছুটে গেলাম। জামাইবাবুর অবস্থা দেখে আমি শিউরে উঠি।—তিনি আর ইহলোকে নেই।

অদৃষ্টের কী মর্মান্তিক পরিহাস! আমাকে দিয়ে শিকার করানোর জন্যেই আজ তিনি প্রাণ দিলেন। তাঁর হাতে বন্দুক থাকলে হয়ত এই সর্বনাশ ঘটত না!

টিক বাহাদুর জামাইবাবুর সঙ্গেই ছিল, চিৎকার করে ডাকি, কিন্তু তার টিকিও দেখতে পেলাম না।

জীবনে সেই আমার প্রথম বাঘ শিকার। আনন্দ করবো কী, চোখের জলে বুক ভেসে গেল।

ফিরে গিয়ে দিদির সামনে কী মুখ নিয়ে দাঁড়াব?

জামাইবাবু ভূলুণ্ঠিত—বাঘ তার উপরে

পৃঃ ৮০

আফ্রিকার জঙ্গলে

অর্জুন সেন বক্তা, ভল্টু তার যোগানদার আর আমি হলাম শ্রোতা। আরও একজন আছেন—আমাদের আচার্যি মশাই। মেয়ের বিয়েতে এক থোক সাহায্য-প্রার্থনায় এসে বাঘের ফাঁদে পড়েছেন। অর্থাৎ ব্যাঘ্র-শিকারের কাহিনা শ্রবণের আগ্রহ তাঁর এতই বেশী যে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা আপাততঃ ধামাচাপা পড়লো।

শীতের সন্ধ্যাকাল। এক রাউণ্ড চা হয়ে গিয়েছে। দু নম্বর অর্ডার জারি করেই অর্জুন সেন বর্মা চুরুট ধরিয়ে নিলে। তারপর মুখভরতি একরাশ ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করেই শুরু করেঃ গতবছর আচ্ছা নাজেহাল হয়েছিলাম এক শিকারে গিয়ে। আমার ভল্টু আবার এমন একটা বেহদ্দ গোঁয়ার, কোথায় আমাকে আগে থাকতেই সাবধান করবে, তা নয়, বিপদের ঝুঁকি যেখানে বেশী, ওর ঝোঁকটাও যেন সেইদিকেই চেপে বসে।

ভল্টু ও জুতসই উত্তর দিয়ে বসল—মেজর সাহেবকে কোনো কাজে বাধা দেওয়ার তামিল আমার নেই।

অর্জুন সেন ঠোঁট বেঁকিয়ে প্রশ্ন করে—তবে তোমার কাজটা কী?

ভল্টু বুক ঠুকে উত্তর দিলে—বিপদে জান দেওয়া!

আচার্যি মশাই-এর ধৈর্য থাকে না, তিনি গায়ের কম্বলখানা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন—এবার বাঘের কথাই হোক।

অর্জুন সেন সোজা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই মুচকি হাসে—এই যে আপনার সামনেই বাঘ এনে দিচ্ছি—একটা নয়, একজোড়া।

আচার্যি মশাই যেন আঁতকে ওঠেন।

—সঙ্গেই আছে নাকি?

—আছে বই কি? ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বাধা দিয়ে বলি—আসল ঘটনা কি হয়েছিল, তাই বলে যাও। শিকারের মালমসলা কী আছে, তাই দেখা যাক।

—সব শিকারেই যে মালমসলা থাকবে, এমন কোনও কথা নেই। আমি তো আর উদ্যোগ-আয়োজন করে শিকারে যাইনি! হাতি ঘোড়া লোক লশকর তেমন নেই, তাঁবুও ফেলিনি। নেহাত রাইফেলটা হাতেই থাকে, ছুটিছাটা পেলেই এদিক-ওদিক জন্তু-জানোয়ারের পশ্চাদ্ধাবন করাটাই স্বভাব। তা ছাড়া উসকে দেবার জন্যে ভল্টু মহারাজ তো আছেনই।

আচার্যি মশাই একটি খাঁটি প্রবাদবচন তাঁর ঝুলি থেকে বের করে ছাড়লেন—একে মা মনসা, তায় ধূপের ধোঁয়া।

ভল্টুর চোখ দুটি ভাঁটার মত জ্বলে ওঠে। অর্জুন সেন ইশারায় থামিয়ে দিতেই তিনি চম্পট।

এবার আমিও অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। বন্ধুবরকে তাগাদা দিই—কই হে, তোমার শিকারের থলেটা একবার খোলো!

অর্জুন সেন চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ছড়িয়ে দিলে—বেশ, তবে আরম্ভ করা যাক। একটানা বলব, কেউ বাগড়া দিও না।

আচার্যি মশাই-এর অর্ধনিমীলিত চোখ দুটি বিস্ফারিত—একটি অস্ফুট ধ্বনি—তা বেশ, বেশ!

অর্জুন সেন বলে যায়—

জানোই তো, বছরে দুমাস ছুটি। একলা মানুষ, কোনো নেশাভাঙ করি না বা রকফেলো নই—

আচার্যি মশাই-এর সত্তমুদ্রিত চোখ দুটি খুলে গেল—রকফেলো আবার কী?

—রকে বসে যারা রকবাজি করে আর রকম বেরকম কথার তুবড়ি ছোটায়। আমার সময়টা তাই পাহাড়ে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে কেটে যায়। দেশভ্রমণের নেশা তো নেই। আমার মনে হয় মানুষের রাজত্বে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতির কোলে যদি সে নিজেকে ছেড়ে দেয় তাহলেই হয়ত নিজেকে খুঁজে পায়। যাক এসব বড় বড় গবেষণা, এখন আসল কথায় আসা যাক!

সেবার ছুটি পাওনা হতেই ঠিক করি, সোজা পাড়ি জমাব কোনো পাহাড়ের কোলে। না না, হিমালয় নয়। তোমাদের ওই দার্জিলিঙ শিলং মুসৌরী রানীক্ষেত কি হরিদ্বারও নয়, কাছাকাছি জয়ন্তিয়া পাহাড়ে। মনে মনে একটা ছক কেটে নিয়েছিলাম, কিন্তু বাধ সাধলে ভল্টু। সেবার ডুয়ার্সে গিয়ে ভালুকের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে যে বিক্রমটা দেখিয়েছিল, তারই গরমে সে তখনও নিজেকে তাতিয়ে রেখেছে। আমাকে অহেতুক উপদেশ দেয়—সাহেব চলুন না, এবারও ডুয়ার্সের দিকেই যাওয়া যাক। ওদিকে যেমন জঙ্গল তেমনি তার জন্তু-জানোয়ার।

একবার ভাবলাম যাই, তার পরই মনটা বিগড়ে ওঠে। আজকাল ওপথে অনেক ঘোরপ্যাঁচ। তাই প্রস্তাবটা সরাসরি ডিসমিস করে দিলাম।

এদিকে আমার এক মারাঠী বন্ধু শাজাহানপুরের কাছে মামুণ্ডিতে থাকেন। তিনিও বারে বারেই ডাকছেন—ওদিকে নাকি প্রচুর শিকার! ফতোয়া জারি করে দিই—রাখো তোমার ডুয়ার্স—চলো মামুণ্ডি—ওখানেই জানোয়ারের মুণ্ডপাত।

কোন্ কাজটি কখন করতে হয় তা ভল্টুর নখদর্পণে—কোনো কথাটি না বলে টাইমটেবলখানা এগিয়ে দেয়।

আমার যাযাবর জীবনের উপযুক্ত সঙ্গী ভল্টু। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সব তৈরী হয়ে নিলাম। তারপর যথাসময়ে ট্রেনে ওঠা এবং পথে দুজায়গায় গাড়ি বদল করে সীতারামপুর হয়ে শাজাহানপুরে পৌঁছলাম। সেখান থেকে জীপ গাড়িতে প্রায় ত্রিশ মাইল যাবার পর আমাদের গন্তব্যস্থল।

আগেই তার করেছিলাম। সস্ত্রীক যশোবন্ত রাও-এর সাদর অভ্যর্থনার কথা কখনও ভুলতে পারব না। তাঁর বিরাট বাংলোর এক পাশে একটা গোটা স্যুইট তিনি আমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। কাজেই কোন অসুবিধা নেই। স্নান করে বেশ তৃপ্তি পেলাম।

চায়ের টেবিলে বসে বারে বারেই মিসেস রাও খিলখিল করে হেসে উঠছিলেন। খুব চঞ্চল প্রকৃতির মহিলা আর বেশ সহজ সরল ভাবভঙ্গী। তাঁর এবংবিধ হাসির কারণ কি, যশোবন্ত রাওকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি পত্নীর সঙ্গে ইশারায় কী যেন বললেন। উত্তরে মেমসাহেব তাঁর কানে কানে কী কথা বলতেই মিঃ রাও উচ্চহাস্যে ফেটে পড়েন আর কি! কোনোরকমে দম নিয়ে রহস্য করে বললেন—আমার স্ত্রী আপনার একজোড়া বিরাট গোঁফ দেখে মুগ্ধ, হাসিটা তারই জন্যে।

ভল্টু কী একটা কারণে সে সময় ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, কথাটা কানে আসতেই তার কাতরোক্তি শোনা গেল—হায়রে ওইরকম জাঁদরেল গোঁফ জোড়া যদি তারও থাকতো!

মেজর সেন যে সেটা স্মরণ রেখেছে আর এ্যাদ্দিন পরেও এখানে যে এমন একট লজ্জা দেবে, তার জন্যে ভল্টু মোটেই প্রস্তুত ছিল না, তবুও বুদ্ধির গোড়ায় জল দিয়ে তখনি একটা কথা তৈরি করে ছেড়ে দিলে—মেজর সাহেবের সঙ্গে আমার এই তো ফারাক—তাঁর গোঁফ আছে, আমার নেই। আর সেই জন্যেই তো লোকে আমাকে ভল্টু বলে চেনে।

আচার্যি মশাই নড়েচড়ে বসলেন। বাঘের কথা ফেলেও উঠতে পারেন না, আবার কন্যাদায়ের তাগাদাও আছে, আরো যে কয়েক বাড়ি আদায়পত্তরের ধান্দায় যেতে হবে!

তাঁর ভাবগতিক দেখে আমি অর্জুন সেনকে ইশারা করতে
াললে—একটু রোসো পণ্ডিত ! আজীবন কেবল অনুস্বর বিসর্গের কচ
ীবনটাকে একটু সরসতায় ভিজিয়ে নেবে ? তারপর কী হোলো, মন

মেজর সেনের তাড়া খেয়েই আচার্যি মশাই নট্-নড়নচড়ন।

অর্জুন সেন আবার গল্পের খেই ধরে :

…মিসেস রাওয়ের আতিথেয়তা যে শুধু চায়ের টেবিলেই হাসির খোরাক
়গিয়েছিল, তাই নয়, তার পর দিন সকালে মেমসাহেবের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি
মারও চমকে উঠলাম। কোন্ ভোরে উঠেই তিনি রাও সাহেবকে ডেকে তুলেছেন ;
শুধু তাই নয়, তাঁর হাঁকডাকে বেয়ারা বাবুর্চী মশালচী থেকে জমাদার দামু পর্যন্ত নাচতে
শুরু করেছে।

আমার শোবার ঘরের বারান্দায় ভল্টুরও খটমট বুটের আওয়াজ। তার এই
্যস্তসমস্ত ভাব দেখে জিজ্ঞেস করি—কী রে এত তাড়া কিসের ? বাঘের ডাক শুনতে
পলি না কী ?

ভল্টু একটা সেলাম ঠুকেই উত্তর দেয়—মেমসাহেব—

তাকিয়ে দেখি, মিসেস রাও আমার এদিকেই আসছেন।

সুপ্রভাত জানাতেই তিনি বলেন—তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন মেজর, আমরা
াবাই প্রস্তুত।

অবাক কাণ্ড ! কোথায় শিকার, কে কে যাবে, তার কিছুই ঠিক নেই—আর
ুম থেকে উঠেই বলে কিনা, চলো !

যশোবন্ত রাও-এর কথা জিজ্ঞেস করতেই মিসেস ফিক করে হেসেই বললেন
—তিনি পোশাক পরছেন। ব্রেকফাস্ট সেরেই আমরা রওনা হব। তিনটে ঘোড়া
মার দুটো হাতি যোগাড় হয়েছে। আপনিও তৈরী হয়ে টেবিলে আসুন।

ঠিক হল, আমি এবং মিস্টার ও মিসেস রাও তিনটে ঘোড়ায় যাব। একটা
়াতির পিঠে ভল্টু আর জমাদার দামু আমাদের পেছনে আসবে, আর একটা হাতিতে
মামাদের খাবার নিয়ে বেয়ারা আর বয় থাকবে।

আমরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ি। আমার কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠ বরাবর

আড়াআড়ি ভাবে রাইফেল বাঁধা। পেছনে দুটো হাতি হেলেদুলে আসতে থাকে। মিসেস রাও আমার আর যশোবন্তের মধ্যে অনর্গল কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেন—উচ্ছল প্রাণশক্তিতে ভরপুর। স্বামী বেচারা কোনো কিছু বলার ফুরসত পান না।

বাংলোর কিছুটা দূরে, প্রায় মাইলখানেক পরেই একটা ছোট্ট নদী—জল নেই বললেই হয়, শুধু বালির চড়া আর মাঝে মাঝেই কশাড় ঝোপ। এখানে এসেই হতাশ হলাম। কোথায়ই বা তেমন জঙ্গল আর কোথায়ই বা আমাদের বাঞ্ছিত গুণনিধি! যশোবন্তকে সেকথা বলতেই মিসেস রাও চটপট উত্তর দেন—ও কথা বলবেন না মেজর সেন, এদিককার জানোয়ারগুলো ভারী চালাক আর ফন্দিবাজ। কখন যে এসে হাজির হবে টেরও পাবেন না।

মাঝে মাঝেই বালুর ঢিবি—তার ওপর ছোট ছোট ঝোপ। আশেপাশে অবশ্য কিছু চাষের জমি আছে—আর সে সময় ভুট্টা আর তামাকের চাষও দেখা গেল। এখানে ওখানে বুনো শুয়োর আর হরিণের পায়ের ছাপ, পাখিও অনেক জাতের—কিন্তু এদিকে নজর দেবার ইচ্ছে আমাদের কারো ছিল না। আরো কিছুটা এগিয়ে যেতেই সামনে একটা বালির স্তূপ, আশেপাশে এলোমেলো ঝোপঝাড় ক্রমেই ঘন হয়ে দূরে আকাশের কোলে মিশে গিয়েছে—সেটাই শিকারের জঙ্গল।

আমরা ক্রমে সেই জঙ্গলের মুখে এসে পড়ি। পাশ দিয়েই নদীটা এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। তাঁর ওপারেই ঘন জঙ্গল—ভেতরে সূর্যালোক প্রবেশ করে না।

এখানে এসেই গাটা কেমন ছমছম করে ওঠে। বাতাসে এমন একটা গন্ধ, এমন একটা থমথমে ভাব, আমার অভ্যস্ত মন জানিয়ে দিল—কাছাকাছি নিশ্চয় কোন বড় শিকার আছে। সে শিকার বাঘ না হয়ে যায় না। কাছেই এমন চাষের জমি, গরু বাছুর ও প্রচুর হরিণ চরে বেড়ায়, তার ওপর পাশেই ছোট্ট নদী, তারপরই বিস্তৃত জঙ্গল—আর চাই কী?

যশোবন্ত রাও আমার দিকে তাকিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করেন যার অর্থ, কী বন্ধু, তোমার পছন্দ মাফিক জায়গা পেলে তো?

জায়গা তো পেয়েছি কিন্তু শিকারের তোড়জোড় কই? খেদা না করলে কি

সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গোঁগোঁ আওয়াজ [পৃঃ ৮৮

বাঘ আপনা থেকে বেরিয়ে আসবে? তিন তিনটে প্রাণী ঘোড়ায় চেপে এসেছি, তাও দিন দুপুরে—বাঘের শিভ্যালরি সম্বন্ধে আমার এমন কোনও গল্প জানা নেই যে সে নিজে থেকে আমাদের চ্যালেঞ্জ করবে।

অতএব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক, যতক্ষণ না হাতি দুটো এসে পড়ে। ইতিমধ্যে চাষীদেরও ডাকা যাক, যদি তারা আমাদের শিকারে যোগ দেয়।

ঘোড়া থেকে আমরা তিনজনেই নেমে পড়ি। পাশেই একটা বড় গাছ, তার ডালপালায় অনেকটা জায়গা জুড়ে ছায়া পড়েছে। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে কী করা যায়, তাই আলোচনা করি। কয়েকজন চাষীও মজা দেখার জন্যেই বুঝি এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। সিগারেট বের করে ধরাতে যাব, এমন সময় চাষীর এক ছেলে জঙ্গলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সেদিকে ঢিল ছুঁড়ে মারে। নিছক খেলা আর কি! আমি লক্ষ্য করিনি, নচেৎ পূর্বেই তাকে থামিয়ে দিতাম।

সামান্য ব্যাপার থেকে কী গুরুতর পরিস্থিতিরই না উদ্ভব হয়! তিন চারটে ঢিল ছুঁড়তে না ছুঁড়তেই জঙ্গলের ভেতর থেকে এমন একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শোনা গেল যে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। সমস্ত শরীরে উত্তেজনার আগুন জ্বলে ওঠে। চাষীদের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাদের মুখচোখ ভয়ে বিবর্ণ, ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে, কথা বেরোয় না!

ঘটনাটি এমনি আকস্মিক আর অভাবিত যে প্রথমটা আমিও যেন কিরকম হতভম্ব হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি আমরা তিন জনেই সেই মোটা গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিই। এক লহমায় একটা বাঘ জঙ্গল থেকে ঝাঁপিয়ে বের হয়ে এলো। বাচ্চা না হলেও ধাড়ী বাঘ নয়, গায়ের ডোরাকাটা দাগগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পলকে দু-তিনটি লাফ দিয়েই বাঘটা এসে সেই হতভাগ্য চাষী ছেলেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে মাটির ওপর লম্বা হয়ে পড়ে গেল।

আমার পেছনে মিসেস রাও ক্রমাগত চিৎকার করছেন—গুলি করুন, মেজর, গুলি করুন—আর দেরি কেন? যশোবন্ত রাও ঠিক করতে পারেন না, গুলি তিনি করবেন কিনা—কী জানি যদি ছেলেটি আহত হয়! আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে আমরাও বাকি থাকব না।

কিন্তু কি আশ্চর্য। বাঘ ছেলেটির দিকে মনোযোগ না দিয়ে বিড়াল যেমন ইঁদুরকে ঘায়েল করে তার ওপর দাঁড়িয়ে খেলা করে, তেমনি ভাবে চারিদিকে চাইতে লাগলো। লেজটা এধারওধার সজোরে দুলতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গোঁগোঁ আওয়াজ। সে যেন তার রাজ্যে উৎপাত সৃষ্টিকারীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে চায়। গাছের আড়ালে থাকায় সে আমাদের হয়ত দেখতে পায়নি।

আকস্মিক এই অবস্থায় মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। তারপরই আমার বন্দুক কাজ করে গেল। গুলি অব্যর্থ—লাগলো তার বুকে। একখণ্ড পাথরের মত বাঘটা ঢলে মাটির ওপর পড়ে গেল।

মিসেস রাও ও যশোবন্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমি নিজেই লজ্জা পেলাম। গ্রামবাসী চাষীরাও এসে ভিড় করে। আমি ছুটে গেলাম সেই বাঘের দিকে—কিন্তু

ভণ্টু হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, জল, একটু জল

পৃঃ ৯৩

খুব সন্তর্পণে। বন্দুকের আর এক নলে গুলি ভরাই আছে। জানি, এই জানোয়ার বড় চালাক, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হয়ে এগিয়ে যেতে নেই। একটা মাটির চাপড়া তুলে তার গায়ে ছুঁড়ে দিতেও বাঘটা পড়েই থাকল। কাছে গিয়ে দেখি সেই চাষী ছেলেটি অজ্ঞান। তাকে টেনে বের করে নিতেই তার জ্ঞান ফিরে এল। গায়ে খুব বেশী চোট লাগেনি, শুধু বাঘের থাপ্পড় খেয়ে তার বাঁ পাঁজরে লম্বালম্বি খানিকটা ছড়ে গিয়েছে আর সেই বাঘের রক্তে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাখামাখি।

এমন সময় দেখি, দুটো হাতি শুঁড় তুলে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে।

বুঝলাম, বন্দুকের আওয়াজ পেয়েই তাদের গদাইলশকরি চালের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। কাছাকাছি আসতেই শ্রীমান্ ভল্টু হাতির ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আমাদের কাছে ছুটে এসেই সভক্তি প্রণাম। মেজাজমাফিক কখনও সেলাম ঠোকে, কখনও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে।

তারপর যা করণীয় অর্থাৎ হাতিকে বসিয়ে তার ওপর বাঘটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নেওয়া হল।

বুড়ো গোছের এক চাষী দাড়ি চুমড়িয়ে প্রাদেশিক ভাষায় ছড়া কাটলে, যার অর্থ—

বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—এবার কী হল বাছাধন ?

এই না বলেই বীরপুঙ্গব বাঘের ওপর দু-এক ঘা লাঠি চালাতেই, ভল্টুর কণ্ঠে বজ্র নির্ঘোষ ! খবরদার—মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা ? এক থাবড়ায় তোর বদন বিগড়ে দেব।

চাষী বেচারিও তখনি চোঁচা দৌড়।

মিসেস্ রাও প্রস্তাব করেন—বাংলোয় ফিরেই লাঞ্চ হবে—এখন যাওয়া যাক।

এমন সময় জঙ্গলের মধ্যে দ্বিতীয় গর্জন। সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন। চাষীরা ভয়ে এদিকওদিক ছুটে পালায়।

যশোবন্তের এক তাড়া—আর কাজ নেই, আজ ফিরে চল—পরে আবার আসা যাবে।

কিন্তু সম্মুখে আর একটা চ্যালেঞ্জ—তাকে পেছনে ফেলে যাই কী করে ? বন্ধুবরকে বুঝিয়ে বলি—তোমরা ফিরে যাও, আমি আর একটা চান্স না নিয়ে যাব না।

—আমাকেও আর এক জায়গায় চান্স নিতে হবে, কন্যাদায় বড় দায়। আজ তো কিছুই হল না, কাল আবার আসব—বেরসিক আচাষ্যি মশাই গাত্র উৎপাটন করলেন।

মাঝপথে রসভঙ্গ হওয়ায় অর্জুন সেনের উক্তি—দেখ পণ্ডিত, এই সব হত্যাকাণ্ড তোমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করেছে, বাড়ি গিয়ে পুজোর আগে গঙ্গাজল ছিটিয়ে 'বাহ্যাভ্যন্তর শুচি' এই সব কথা বলবে তো? তোমাদের তো একটু মুখের কথায় সব শুচি হয়ে যায়—যাও, যাও, আর দেরি করো না।

আচাষ্যি মশাই-এর ঝটিতি প্রস্থান।

অর্জুন সেনের গোঁফের আড়ালে চকিত হাসি, তারপরই আবার শুরু করে:

···আমার এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞায় মিসেস রাও মধু-ভেজান গলায় অনুযোগ করেন: আপনার খাওয়া হয়নি, কষ্ট হবে না তো?

—কুছ পরোয়া নাই—কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে? আপনি বরং টিফিন-কেরিয়ারটা ভন্টুর জিম্মায় দিন।

যশোবন্তকে বলি—ভাই, তোমরা যাও। আমি ঠিক ঘণ্টা দুই পরেই ফিরে আসব। একটা হাতি আমার চাই কিন্তু।

ভন্টুকে ডাক দিতেই সে চটপট হাতির ওপর টিফিনকেরিয়ার নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে। আমিও কালবিলম্ব না করে উঠে পড়ি। মিস্টার ও মিসেস রাও ঘোড়ায় চেপে বসতেই তাঁদের বেয়ারা আমার ঘোড়াটির ওপর সওয়ার হল। বিদায় জানিয়ে আমরা রওনা হলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি, মিসেস রাও চলছেন আর মাঝে মাঝেই মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখছেন।

আমরা জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

হাতিটা শিকারে অভ্যস্ত হলেও তার নিজের মাহুত না থাকায় সাময়িক মাহুতের নির্দেশ যেন পুরোপুরি মানতে চায় না। কয়েক পা গিয়েই থমকে যায়। অবশ্য তারও বোধহয় কারণ ছিল। জঙ্গলের মধ্যে দশ-বারো পা এগিয়ে যেতেই আর একটা তীব্র গর্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই হাতিটি কান দুটো ঝাপটা মেরে শুঁড় তুলে এদিকওদিক ছুটে পালাতে চায়। মাহুত প্রাণপণে তাকে শাসন করে, মাথায় ডাঙ্গশ মারে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দেয়, কিন্তু হাতির সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

বাঘটা হুমড়ি খেয়ে পড়েই··· [পৃঃ ৯২

তাকে দোষ দেব কী ? নতুন মাহুত—তার মন-মেজাজ কিছুমাত্র বোঝে না। তার ওপর জঙ্গলের মধ্যেও একা, অদূরে বাঘের গর্জন। খুব পাকা শিকারী হাতির পক্ষেও মগজ ঠিক রাখা কঠিন। কাজেই আমাদের বাহনও সটান জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল।

খানিকটা খোলা জায়গা পেয়ে হাতিটা যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। আমিও ওপর থেকে নেমে পড়ি, তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিই—আদর করি। তাতেও ওই বিরাট জন্তুটির চোখে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি।

ভল্টুর যেন সেটা সহ্য হয় না, সে নীচে নেমেই মুখ ভেংচিয়ে বলে ঃ—হুজুর, এটা কোনো কাজের নয়—

—না না, ওর দোষ নেই। ওর নিজস্ব মাহুতও এভাবে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালাতো না।

যাই হোক, সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই। ভল্টু আমারই শাগরেদ, তাকেও জিজ্ঞেস করি—এখন কী করবি, তাই বল্ !

—মালিকের যা মর্জি, আমারও তাই মত।

—তবে আয় আমার সঙ্গে।

আমরা দুজন পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়ে যাই। তারপরই থমকে দাঁড়াতে হয়, কারণ সামনে বিরাট খাদ। ভূমিকম্পে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সামনের বেশ কিছুটা জায়গা বসে গিয়েছে। তার মধ্য দিয়েই নদীর একটা খাত। জল সামান্য, হাঁটু ডোবে না। ওপারে অনেকটা জায়গা জুড়ে বালির চড়া ক্রমে উঁচু হয়ে ওপরে সমতলভূমিতে মিশে গিয়েছে। সেখান থেকেই আবার জঙ্গল।

বন্দুক হাতে আমরা দুজন এগিয়ে চলি। এদিকওদিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সমীক্ষার ক্রুটি নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল নদীর খাতের পাশেই যে বড় গোছের ঝোপটা, তার ফাঁক দিয়ে ডোরাকাটা একখানা মখমলের মত কী যেন ঝিকমিক করে ওঠে। ভল্টুর কানের গোড়ায় মুখ লাগিয়ে বলি—চল, নীচে নেমে যাই।

পা টিপে টিপে কিছুটা এগিয়ে গেলাম। এমন সময় বাঘটা ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে নদীর খাতটা পার হয়ে যায়। যেই তাকে রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া অমনি গুলি ছোঁড়া—বাঘটা হুমড়ি খেয়ে পড়েই আবার জল থেকে উঠে সেই বালুর চরের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকে।

আমি তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য—ভল্টুও তাই। নদী পার হয়ে বাঘের পেছনে ছোটার নেশায় তখন আমাকে পেয়ে বসেছে।

হিসেবে যে কতটা ভুল, আর সেই ভুলের যে কী পরিমাণ মাশুল দিতে হয়েছিল, সে আর বলার কথা নয়। ভেবেছিলাম বাঘটা যখন একবার গুলি খেয়েছে, তখন তার বেশী দূর যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না। আমরা হয়ত মহাপ্রভুর নাগাল পাব। কিন্তু সেই শয়তান বাঘটা আমাদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে তার পেছনে ছুটিয়ে মারে—কিছুতেই পাল্লার মধ্যে আসে না। আমরা বহুদূর চলে গিয়েছি—খিদে যতটা, তেষ্টা তার চাইতে ঢের বেশী। হাতিটাকেও ফেলে এসেছি বহু দূরে।

ভল্টুকে কি বলতে যাব—হঠাৎ সে বসে পড়ল।

সামনে তাকিয়ে দেখি বাঘ অদৃশ্য!

পেছনে তাকিয়ে কিছুই চোখে পড়ে না।

বেলা শেষ !

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে।

কী করা যায় ?

ভল্টু হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, জল, একটু জল !

মহা মুশকিল ! কী করি !

এদিকওদিক ছোটাছুটির পর হাঁকাহাঁকি করেও জনমনুষ্যের সাড়া নেই। অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গতি কী ? ফিরে এলাম। ভল্টুকে সাহস দিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে চাই। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, শুকনো গলায় বলে—ফিরে চলুন।

—সে কী ? অন্ধকার হয়ে এল যে, এখন ওদিকে যাওয়া মানেই নির্ঘাত মৃত্যু।

ভল্টুর মুখে ম্লান হাসি। সে আকাশের দিকে তাকায়, বলে,—ওই দেখুন, চাঁদ উঠেছে, ওই আলোতেই আমরা পথ চলব।

টলতে টলতে আমরা এগিয়ে যাই। নদীর কাছাকাছি যেতেই ভল্টু ওপারে আঙুল দেখিয়ে আশ্বাস দিল—ওই যে হাতিটা, মাহুত নিশ্চয় আমাদের খোঁজে এসেছে।

সামনে জল। ভল্টু যেন তার সবটাই শুষে নিতে চায়। আমিও আকণ্ঠ পান করি।

ওপারে পৌঁছতেই মাহুত ধমক দেয় আর কি—বলিহারি আক্কেল ! আপনাদের জানের ডর নেই ?

ভল্টুর বাহাদুরি আছে। এই অবস্থাতেও সে সোজা হাতির পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে তার লেজ ধরে কোনও রকমে পিঠের ওপর বসেই ইশারা দেয়—বৈঠ !

লক্ষ্মীছেলের মত হাতিটা বসে পড়তেই আমি তার ওপর উঠলাম বটে, কিন্তু সমস্ত শরীর এমন থরথর করে কাঁপতে লাগলো যেন ডুয়ার্সের বনেদী ম্যালেরিয়া আমাকে পাকড়াও করেছে।

সেবার বেশ কিছুদিন ভুগিয়েছিল। পাক্কা তিনমাস বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি।

———

বাঘ-শিকারে চূড়ান্ত হয়রানির গল্পটা শেষ করেই অর্জুন সেন ভালুকের কথায় এসে পড়ল। আমারই জনৈক বন্ধু সেখানে বসে। তিনি বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে প্রশ্ন করলেন—ভালুকের গল্প কী তেমন চমকদার হবে?

—নিশ্চয়, যেমন বাঘ-শিকারে, তেমনি ভালুক-শিকারেও যথেষ্ট উন্মাদনা আছে এবং বিপদ যে কিছু কম তাও বলা চলে না।

ভালুকের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমারও আছে, তাই অর্জুনের কথায় সায়

দিয়ে বলি—সেটা আমিও জানি—নিজেও ভুক্তভোগী কিনা! তবে অন্যান্য জানোয়ারের তুলনায় ভালুককে নিরীহ বলা চলে।

—না না, নিরীহ নয়, বরং বলতে পারো বোকা। তাহলে শোনো ওদের কথা। আমি বেশ খুঁটিয়ে দেখেছি। জন্তু-জানোয়ারের জগতে ভালুককে ভাঁড় বলেই ধরে নেওয়া যায়। আবার এমন খামখেয়ালী আর হুঁশিয়ার জন্তুও তুমি খুঁজে পাবে না। নানান জাতের বাঘের তুলনায় ভালুককে তেমন বিপজ্জনক মনে হয় না বটে, কিন্তু হঠাৎ যদি এই জীবটির সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যায়, তবে তিনি কখন যে কী মূর্তি ধারণ করবেন, তার ঠিক নেই। তাই তাঁর সম্বন্ধে সর্বদাই সাবধান হয়ে চলা উচিত, কারণ ভালুকের নির্বুদ্ধিতাই তাকে হয়ত এমন একটা অবস্থার মধ্যে এগিয়ে দেবে, যেখানে বাঘও স্বেচ্ছায় কখনো যেতে চায় না। সাধারণতঃ ভালুক মানুষকে ভয় করে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিজের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করে না।

ভালুকের স্বভাব খুঁতখুঁতে হলে কি হয়, মেজাজটা খুব চড়া। যেখানে কোনও গণ্ডগোল নেই, সেখানেও সে নাক গলায়, আর যেখানে বিপদ আসতেই পারে না, তারা নিজেরাই বরং বিপদকে ডেকে আনে। তবে ভালুককে গুলি করলে যদি সে খতম না হয়, তবে ফিরে সে আততায়ীকে আক্রমণ করবেই।

একবার উত্তর কাছাড়ের পাহাড়-অঞ্চলে ক্যাম্প করেছিলাম। একঘেয়ে কাজ যখন ভাল লাগতো না, এদিক ওদিক ঘুরে দেশটাকে ভাল করে দেখে নেবার ইচ্ছে হত। পাহাড়ী জংলা জায়গা, কাজেই বন্দুকটা সঙ্গেই থাকে।

ক্যাম্পে প্রায়ই রিপোর্ট আসে—পাশের গাঁয়ে ধানের জমিতে ভালুকের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। আর কিছুদিন এভাবে চললে একটি দানাও চাষীরা ঘরে তুলতে পারবে না। আমি গা করিনি। ভালুক-শিকারে তেমন উৎসাহ নেই। ভল্টু মাঝে মাঝে আমাকে উসকে দেবার চেষ্টায় থাকে। একদিন বেলা দুটোর সময় গ্রামবাসীরা এসে জানায়, দু-দুটো ভালুক বেরিয়েছে। ধানের ক্ষেতে তাড়া খেলেই তারা আপন ডেরায় ফিরে যাবে।

মাতব্বর গোছের একজনকে জিজ্ঞাসা করি—ডেরাটা কোথায় ?

—হুই—হুই যে পাহাড়, ওর মধ্যে গর্ত করে ওরা থাকে।

আবারও প্রশ্ন করি—তুমি চেন ? আমাদের নিয়ে যেতে পারবে ?

বিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের মত মাথা নেড়ে লোকটি জানায়—হ্যাঁ, এসব অঞ্চল তার নখদর্পণে। তখুনি রওনা হলে বেলাবেলি ফিরে আসা যাবে।

জিজ্ঞাসায় জানলাম, তার নাম টঙ্কনাথ—। কিছু জোতজমি আছে, চাষবাস করে, ভগবানের কৃপায় দিন চলে যায়। ভালুকের অত্যাচারে ফসল নষ্ট হলে তারা সবংশে না খেয়ে মরবে—তাই ভল্লুকবংশের যথাসম্ভব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্নের জন্যেই আমার কাছে আগমন।

ভল্টুর প্রতি আমার তির্যক্‌দৃষ্টি। সেও গ্রীবাভঙ্গীতে সম্মতি জানায় আর তখুনি তৈরী হয়ে নেয়। আমিও টঙ্কনাথের সঙ্গে এদিককার হালচাল নিয়ে কথা বলি আর এগিয়ে চলি।

ক্যাম্প থেকে প্রায় মাইলটাক পথ যাবার পরই পাহাড়ের নীচে পোঁছানো গেল। এদিকওদিক তাকিয়ে দেখি কোথাও কিছু নেই। আমরা একটা পাহাড়ে উঠতে থাকি। এবড়োখেবড়ো পায়ে চলা পথ—এঁকেবেঁকে ওপরে চলে গিয়েছে। কিছুদূর উঠতেই একটা গুহার মত দেখা গেল। টঙ্কনাথ আঙুল দেখিয়ে বললে—ওই যে ভালুকের আস্তানা।

আমি ধরে নিয়েছিলাম, ধান খেতে তাড়া খেয়ে ভালুক দুটো নিশ্চয় ফিরে আসবে। কিন্তু, কোথায় ? কোনও পাত্তা নেই ! টঙ্কনাথকে সেকথা বলতেই সে আশ্বাস দিল—নিশ্চয় আসবে, আর যাবে কোথায় ?

এমন সময় দেখা গেল পাহাড়ের নীচে যেখানে উঁচু ঘাসের জঙ্গল তার মধ্য দিয়ে কিছু দূরে দূরে দুটো প্রাণী চলে আসছে। ঘাসের ডগাগুলি শুধু নড়ছে, আর কিছু দেখা যায় না। আরও একটু কাছে আসতেই, জানোয়ার দুটির পিঠের ওপর-ভাগটা দেখতে পেলাম—কালো লোমে ঢাকা।

টঙ্কনাথ টাক চুলকে বলে—ওই যে ভালুক !

ঘন ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে আসছে দুটো জানোয়ার—একটা ধাড়ী ভালুক, পেছনে বাচ্চা।

ঘন ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে জানোয়ার দুটো হালকা ঘাসের মধ্যে এসে পড়তেই দেখা গেল—একটা ধাড়ী ভালুক, পেছনে বাচ্চা। পাহাড় বেয়ে ভালুক দুটো উঠতে থাকে। অনেকটা উঠে এসেছে, আমাদের কাছ থেকে প্রায় সওয়াশো গজ দূরে, যে ভাবে হেলতে দুলতে আসে, গুলি করার কোনও অসুবিধা নেই। আমার বুলেট কিন্তু ধাড়ী ভালুকটার কাঁধে মেরুদণ্ডের ওপর না লেগে আঘাত করল তার পেছনে। গুলি খেয়েই ভালুকটা পেছন ফিরে দাঁড়ায়। বোধহয় ভাবলে, বাচ্চা ভালুকটাই তাকে আঘাত করেছে। তাই প্রচণ্ড বিক্রমে সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে ক্রমাগত আঁচড়াতে আর কামড়াতে থাকে—শেষ পর্যন্ত তাকে মেরেই ফেললে, এমনি নির্বোধ জানোয়ার।

ধাড়ী ভালুকটার ওপর আর এক রাউণ্ড গুলি—সেটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বন্দুকের আওয়াজ পেয়েই ভালুকটা পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে—যেন দেখতে চায়, এ আবার কোন্ আততায়ী। তার বুকখানাকে খোলা পেয়ে আমার বন্দুক আবারও গর্জে ওঠে—আর সেই ধাড়ী কালো ভালুকটা সটান বাচ্চার পাশেই ধরাশায়ী।

আর একবার, ভল্টু আর টঙ্কনাথকে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি নদীর পাড়ে বসে আছি। সেদিন খাটুনিও হয়েছে খুব। নদীর পাড় অনেকটা উঁচু, প্রায় পঁচিশ ফুট নীচে দিয়ে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। দিনের শেষ—ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়ায় শরীর মন জুড়িয়ে গেল।

ক'দিন কোনও শিকার হয়নি। মাঝে একদিন শুধু একটা হরিণ আর দুটো দাঁতাল শুয়োর পেয়েছিলাম। এ দিনও ছুটোছুটিই সার, সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে একবারও গুলি ছোঁড়ার সুযোগ আসেনি। নদীর পাড়ে বসে খানিকটা জিরিয়ে নিচ্ছিলাম বটে, কিন্তু চোখকান সজাগ।

হঠাৎ অনেক দূর থেকে একটা শাখের আওয়াজের মত কানে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার সেই শব্দ। কান খাড়া করে বেশ বোঝা গেল, ডাইনে থেকেই আওয়াজটা আসছে আর খুব বেশী দূরেও নয়।

টঙ্কনাথ এদিককার সব কিছুই ভাল জানেশোনে—সেই পথ দেখায়। প্রায় একশো গজ যাবার পরই সামনে একটা বিরাট খাদ—তার তল ঘেঁষে পাহাড়ী ঝরনা নদীর দিকে চলে গিয়েছে। টঙ্কনাথ আমার কথায় সায় দিয়ে বললে—আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, ভালুকটা নিশ্চয় ঝরনায় জল খেতে এসেছে।

ছোট ছোট ঝোপের ভেতর দিয়ে আমরা সেই খাদের কিনারায় এসে পড়ি। উঁকি দিয়ে দেখি, এধারওধার অনেকটা জায়গা ফাঁকা। খাদের পাড় থেকে ঝরনার জল পর্যন্ত কোনও ঝোপ-জঙ্গল নেই।

কোনো ভালুক দেখা গেল না, কিন্তু ভালুকের ক্ষুব্ধ আক্রোশ আর আস্ফালনের সুস্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া যায়। কয়েকবার কয়েকরকম শব্দ শোনা গেল। বুঝতে কষ্ট হল না যে ভালুকের রাজ্যে অরাজকতা শুরু হয়েছে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। শীঘ্রই মূর্তিমান দৈত্য মহারাজ সশরীরে দর্শন দিলেন, আর তাঁর পেছনেই স্বয়ং পাটরানী। গজ দশেক পেছনে একটি বাচ্চা ভালুক, যার সাবালক হতে আর দেরি নেই। তিনটি জানোয়ারই সমানে গাঁগাঁ করতে থাকে আর এদিকওদিক ছিটিয়ে পড়ে থাকা খাবারের টুকরো খুঁটে খায়। তিন-চার মিনিটের মধ্যেই তারা আমাদের রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়ল। ধাড়ী ভালুকটা বেশ

হৃষ্টপুষ্ট আর কুচকুচে কালো। গুলি করতেই লাগলো তার বুকে। কোনো প্রতিবাদ না করেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। এক সেকেণ্ডও দেরি না করে আমি মাদী ভালুকটাকে তাক করলাম, কিন্তু ততক্ষণে সে একটা লাফ দিতেই গুলিটা তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেও মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ল বটে কিন্তু তখনি উঠে বীরবিক্রমে রুখে দাঁড়াল। বাচ্চাটা বন্দুকের আওয়াজ পেয়েই ছুটে কোথাও পালাতে চায়। কিন্তু আগের মত এই ধাড়ী ভালুকটাও ভাবল বুঝি বাচ্চাটাই তাকে আঘাত করেছে, তাই সে বীরবিক্রমে আপন বাচ্চার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সেও তখন ছুটেছে, কাজেই তাকে সম্পূর্ণ নাগালের মধ্যে না পেলেও ক্রমাগত তার পেছনে থাবা মারতে থাকে। এতেই আমিও কিছুটা সময় পেয়ে গেলাম, আর পর,পর দুটো গুলিতে দুটোই অক্কা।

চক্ষুচড়কগাছ করে বসে-থাকা বন্ধুটিকে আমিও বলি—

হাঁদা ভালুকের কথা অমৃত সমান।
অর্জুন সেন ভনে শুনে পুণ্যবান॥

বুড়ো ভালুকের জোয়ান বৌ

আমি একদিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে চোখ বুলিয়ে আপন মনেই খুব হেসে উঠলুম। বিষয়টি 'পাত্রী চাই' লেখা আছে—পাত্রের বয়স বেশী নয়, মাত্র পঁয়তাল্লিশ। তিন পুত্র, চার কন্যা, তাদের দেখাশোনা করবার জন্যে একটি অভিভাবিকার প্রয়োজন। গিন্নীবান্নীগোছের হলেও ক্ষতি নেই তবে তরুণী হলেই অগ্রাধিকার। এক কপর্দকও পণ দিতে হবে না—শিক্ষিতা না হলেও চলবে। আবেদন করুন—বক্স নম্বর অমুক অমুক।

সামনে আমার সহপাঠী বন্ধু বঙ্কিম ওরফে বঙ্কেশ্বর। সে আমার হঠাৎ হেসে ওঠার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি ওই পাত্রীর অংশটা পড়ে শোনাই।

তার মন্তব্য—খেপেছো? পাত্রের বয়স অন্ততঃ বিশ বছর বেশী, পঁয়ষট্টি বছর বয়স। নিদেন পক্ষে পঞ্চান্ন পঁয়তাল্লিশ হতেই পারে না।

আমাদের দুজনের মধ্যে যখন খুব হাসির হররা চলছিল, এমন সময় অর্জুন. সেনের প্রবেশ। আজ দু'দিন হল আমার অতিথি সে। হাসির কারণ না জেনেই সেও একচোট হেসে উঠল, তারপর একটু সামলে নিয়ে আমাদের এত ফুর্তির কারণ কী জিজ্ঞাসা করে। বিজ্ঞাপন বৃত্তান্ত জানার পর তার অট্টহাস্য গোঁফের আড়ালে লুকিয়ে গেল। তার নাসিকা কুঞ্চিত এবং সুবিজ্ঞ উক্তি—ওঃ, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। সে আর বেশী কথা কী? এরকম তো আকচার হচ্ছে। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও যা দেখি, মানুষের মধ্যেও তাই। কিস্যু তফাত নেই—

—কী রকম?

—তবে শোনো একটা ঘটনা!

—জানি তোমার ঝুলিতে রঙবেরঙের শিকার—শুনতে রাজী আছি একটা শর্তে—গৌরচন্দ্রিকা না করে যদি বল।

বাইরে জোর হাওয়া, ভেতরেও জোর শিকারের গল্প!

পূজার পূর্বে আচমন, অঙ্গন্যাস, আসনশুদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন করা হয়, এবার কিন্তু অর্জুন সেন শিকারের পাঁয়তারা না করেই বিনা ভূমিকায় বলতে থাকে ঃ

—বাঘের মত ভালুকরাও যদি আঘাত পায়, তবে তারা সামনাসামনি পেলে শিকারীকে চিবিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। উত্তর কাছাড়ের অনেক পাহাড়েই পাথরের খনি আছে। পাথুরে চুন তৈরি করার জন্যে পাহাড় কেটে বড় বড় গর্ত করা হয়। তারপর দীর্ঘদিন সেগুলো অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। ফলে জঙ্গল-ভরতি কতকগুলো ভালুকের আস্তানা সৃষ্টি হয়। এইরকম একটা পাথরখনির দিকেই একদিন রওনা হয়ে গেলাম। সঙ্গে আমার চিরপুরাতন ভল্টু।

আমার গাইড টঙ্কনাথ পূর্বেই সাবধান করে দিলে—সাহেব, এবার খুব হুঁশিয়ার, মাদী ভালুকটা নরমাংস ছাড়া কিছু খায় না। ভীষণ জাঁদরেল চেহারা আর বেজায়

সাহেব, খুব হুঁশিয়ার, মাদী ভালুকটা নরমাংস ছাড়া কিছু খায় না! [পৃঃ ১০২

বেপরোয়া। প্রায়ই ধানক্ষেতে হামলা করে আর মানুষ দেখলেই তাকে সাবাড় করে ভোজনপর্বে মেতে ওঠে।

—সে কী রে? আমাদের দিশী ভালুক তো মাংস খায় না! তারা যে সেকেলে ফলারে বামুনের মত খাঁটি নিরামিষ।

টঙ্কনাথের মুখে প্রতিবাদের সুর—আমরাও তো তাই জানতাম, কিন্তু চাক্ষুষ দেখার পর সেটা আর বলি কেমন করে?

ভল্টু বরাবর চুপ করেই ছিল, এবার কিছু না বললে যেন তার ওজনটাই কমে যায়—তাই বিজ্ঞের মত উক্তি করে—খুব সম্ভব সাইবেরিয়ার ভালুক, পথহারা এক পথিকের মত তিব্বত হয়ে এদিকে নেমে এসেছে। ওরাই বেশী নরখাদক হয়।

—চোখ একরকম দেখে, কান অন্য রকম শোনে। তাই চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন না হলে বিশ্বাস নেই।

টঙ্কনাথ পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আর এই নরখাদক ভালুকের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী শোনায়—এটা একটা মাদী-ভালুক। যেমন বিরাট বপু তেমনি তার ভীষণ আক্রমণ। মাঠে যখন চাষীরা কাজ করে, ভালুকটা ওত পেতে বসে থাকে। যেই কোনও চাষীকে একলা পায় ছুটে এসে এক থাবায় তাকে উলটে দেয়। তারপরই সামনের দুপা দিয়ে লোকটাকে চেপে ধরে আর তার গায়ের মাংস কামড়ে ছিঁড়ে খায়। মানুষের মুখের ওপরই তার লোভটা বেশী। প্রথমেই এক কামড়ে নাক আর মুখের মাংস ছিঁড়ে নেয়—তার পর সেই লোকটাকে উলটেপালটে দেহের অন্যান্য অংশের মাংস খেয়ে উদরপূর্তি করে।

নরখাদক ভালুকটাও চুনা পাথরের গুহার মধ্যে কোনও একটাতে থাকে, স্থানীয় লোকদের কাছে সংবাদ পেলাম। টঙ্কনাথ বললে, সে নিজের চোখে দেখেছে সেই মাদী ভালুকটাকে, আর কোন্ দিকে তার আনাগোনা, সেটাও তার বিশেষ জানা আছে।

টঙ্কনাথ সত্যই খুব কাজের লোক। এমন একটা ঘোরানো পথে সে আমাদের নিয়ে গেল যে আমারই মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। কিছুক্ষণ পরে আমরা ঠিক সেই গুহার কাছাকাছি এসে পড়লাম, যার মধ্যে সেই নরখাদক ভালুকের আস্তানা। টঙ্কনাথের সদম্ভ উক্তি—সে অনেকদিন থেকেই ভালুকটার ওপর নজর রেখেছে।

আমরা পেছন থেকে পাহাড় বেয়ে উঠেছি। গুহাটা বাঁ-দিকে, তার সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, এলোমেলো পাথরের টুকরো আর ছোট ছোট ঝোপ। আমরা গুঁড়ি মেরে একটা ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এদিক-ওদিক কড়া নজর করে দেখি, সর্বনাশ! সামনেই একটা বিরাট গুহা যেন হাঁ করে আছে। তারই পাশে ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে বসার মত, পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে অতিকায় এক ভল্লুকী বসে আছে। তার পেছনের পা দুটো সামনে ছড়ানো, সম্মুখের দুই হাতে কোনও জন্তুর মাংস একমনে চিবিয়ে চলেছে, গালের দুকশ বেয়ে লালা ঝরে পড়ছে। সেই বীভৎস মূর্তি দেখে মনে হল—নরমাংস ছাড়া যে এঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেটা তাহলে উড়ো খবর নয়।

পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে দু হাতে একমনে কোন জন্তুর মাংস চিবিয়ে চলেছে। [পৃঃ ১০৪

সময় আর নষ্ট করা উচিত হবে না। আমার ·৫০০ এক্সপ্রেস বুলেট সেই ভল্লুকীর মাথাটাকে চূর্ণ করে দিতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গুহার ভেতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ হুংকার শুনলাম। ভল্লুকপ্রবর যে ভেতরেই আছেন এবং তাঁরও চেহারাখানা যে দশাসই হবে, সেটা অনুমান করেই তৈরী হয়ে নিলাম। মুহূর্তের মধ্যে একটি জানোয়ার বেরিয়ে এসেই ধাঁ করে পাশের একটা খাদের মধ্যে নেমে গেল—তারপরই কী মনে হওয়ায় আবার আমাদের দিকেই আসতে থাকে। মাদী ভালুকটা যেখানে পড়ে আছে, সেখানে এসেই সে যেন বুঝতে পারে অঘটন একটা কিছু ঘটেছে। পেছনের দু পায়ে ভর দিয়ে, কপালে সামনের একটা পা ঠেকিয়ে সে যেন সীমান্তপ্রহরীর মত সজাগ দৃষ্টি নিয়ে চারদিকে দেখে নিতে চায়। তার

বুকের সাদা দাগটা স্পষ্ট চোখের সামনে ফুটে উঠতেই, আমার দ্বিতীয় গুলিতে তিনিও পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। ভন্টুও তো সাহসী কম নয়, সে একদিন ভালুকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিল। বুক ফুলিয়ে দু-চারটে পাথরের টুকরো সেই গুহার দিকে ছুঁড়ে মারে, কিন্তু আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

গুটি গুটি পা ফেলি আর এগিয়ে দেখি দাঁত-পড়া একটি অতি কৃশকায় লোম ওঠা বুড়ো ভালুক তরুণী ভার্যার বীর দাপটে এতদিন জীবন্মৃত হয়েই ছিল···আজ আমার গুলিতেই তার মহামুক্তি।

তাই বলছিলাম না, জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও যা, মানুষের মধ্যেও ঠিক তাই!
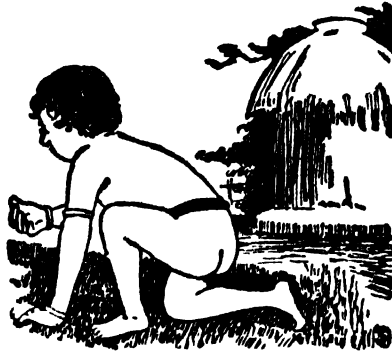
অগ্রাণ মাস, সবে শীতের আমেজ পড়েছে।

আর একটু বেশী হলেই আমাদের বার্ষিক-শিকার-ক্যাম্পের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠব। এবার কোন্ দিকে যাওয়া যায়, তাই নিয়ে সদ্যসমাগত আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। উড়িষ্যার জঙ্গল কিংবা উত্তরপ্রদেশের কাঠগোদাম, অথবা মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগনার কোনও ঘন অরণ্যে তাঁবু খাটানো হবে, এ-পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে কিছুই ঠিক হয়নি। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কবিবন্ধু অবনীকান্ত বললে,—শিকারে তোমার সঙ্গে গিয়ে মজাটা মন্দ হয় না। তুমি তো রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, দিনরাত এ জঙ্গল থেকে ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও, খাবার সময়টা পর্যন্ত তোমার ঠিক থাকে না—আমার কিন্তু ঠিক তার উলটো—দিব্যি খেয়েদেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমনো, আর মাঝে মাঝে তোমরা ফিরে এলে সংবাদ নেওয়া, এই দুটি কাজ ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্যেই প্রশ্ন করি,—কেন, তোমার কবিতা ?

—আরে, সে তো সঙ্গের সাথী—বুকেই উৎপত্তি বুকপকেটেই তার অবস্থান। তবে কিনা তোমার প্রিয়তম সুহৃদ্ অর্জুন সেন শুধু মুখেন মারিতং জগৎ ; কোনদিন দেখলাম না, একটা পাখিও মেরে নিয়ে এলো।

অবনীকে আপাততঃ রেহাই দিয়ে অর্জুনকে নিয়েই পড়া গেল। তাকেই ধরে বসলাম—সত্যি ভাই অর্জুন, সব্যসাচী তোমার নাম, তোমার নিজের শিকার বলে কি কিছুই নেই ? এদিকে অনেক কথাই তো বলে থাক, দু-একটা পরামর্শও মন্দ লাগে না, তোমার নিজস্ব শিকারের একটি কাহিনী আজ বলতেই হবে, এড়িয়ে গেলে চলবে না।

যুদ্ধফেরতা অর্জুন সেন, একজোড়া গোঁফের ফাঁকে এক টুকরো হাসির ঝিলিক দেখিয়ে বললে—বেশ, তবে শোনো ; কিন্তু একটা শর্ত তোমাদের মানতে হবে।

—স্বচ্ছন্দে !

—হ্যাঁ, আমার কথা শেষ না হওয়া তক্ তোমাদের চুপ করে থাকতে হবে।

—এ আর বেশী কথা কি ? এবার তুমি শুরু কর !

অর্জুন সেন চেয়ারে হেলান দিয়ে বলতে থাকে—মাঝে মাঝে উত্তেজনায় তার মেরুদণ্ড সোজা হয়ে ওঠে ঃ

—"প্রথমেই বলে রাখি, শিকারে যাবার সময়, আমাদের আয়োজনটা প্রায়ই নিখুঁত হয়ে থাকে। শিকারের জঙ্গল বেছে নেওয়া পারমিটের হাঙ্গামা পোয়ানো, লোক-লশকর যোগাড় করা, বন্দুক টোটা প্রয়োজন মত যুগিয়ে রাখা, আরও কত কি ! সুযোগ-সুবিধা মত হাতি পেলে তো কথাই নেই, তারপর জঙ্গলে গিয়ে আস্তানা করা, মাচান বাঁধা, মোষের বাচ্চা বা ছাগল সংগ্রহ করা, "বেট" চাই তো !

কাজেই একবার শিকারের কথা উঠলেই, আর সব কাজ চুকিয়ে দিয়ে, এরই মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হয়। শিকারে গেলেই-যে রোজ Red Letter Day হবে, তা মোটেই নয়, হয়ত দু'তিন মাসের অনাহার, অনিদ্রা, অশ্রান্ত পরিশ্রমের পর একদিন শিকার পাওয়া যায়, আবার এও দেখা গিয়েছে যে উপর্যুপরি হয়ত শিকার হয়ে গেল। শিকারের দেখা মিললেও যে তাকে বাগে আনা কতখানি কঠিন,

তা ভুক্তভোগীরা নিশ্চয়ই জানেন। সুতরাং আয়োজন পর্ব দেখে যদি-ই বা মনে হয় যে শিকার অবধারিত, জঙ্গলে গিয়ে কিন্তু প্রায়ই নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে হয়।

আবার এও দেখা যায়, যারা হয়ত কোনও দিন শিকার করেনি, ঘটনাচক্রে শিকারে সঙ্গী হয়েছে মাত্র, তারাই এমন ফলাও করে বর্ণনা দেয় যে মনে হয়, আসল শিকারের অভিজ্ঞতা নেই বলেই হয়ত তারা কল্পনার রাজ্যে এনতার বাঘ মেরে থাকে আর বড়াই করে বেড়ায় অমুক বাঘটা চোদ্দ ফুট লম্বা—অমুক বাঘটা তের ফুট আট ইঞ্চি—যেন এক ইঞ্চির তফাত হলেই তাদের শিকারের গৌরব হানি হয়ে যাবে।

আসলে, আমরা যেসব বাঘের গল্প সাধারণতঃ শুনে থাকি, প্রকৃত শিকারে কিন্তু বাঘের সে রকম আচরণের বালাই নেই। সাধারণতঃ বাঘ অত্যন্ত ধূর্ত আর সহজেই তার নিজের বিপদের কথা বুঝতে পারে। সুযোগ থাকলে বিপদের মুখে সে কখনোই পড়তে চায় না। সে জানে, বেঁচে থাকলে, সে তার বীরত্বের পরিচয় আরও দিতে পারবে। তাই, যখনই হাতি আর লোকজন নিয়ে কোনও জঙ্গলে ঢোকা যায়, আর যদি সেটা বাঘের আস্তানা হয়, তবে বাঘ সাধারণতঃ নিজের চলাফেরার একটা পথ নিজেই বেছে নেয়; আর কোনও রকম আক্রমণের গন্ধ পেলেই, খুব কৌশলে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।

অবশ্য, নরখাদক বাঘের কথা স্বতন্ত্র। তারা প্রায়ই ধাড়ী বাঘ, হয়ত দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে ; গলিত-নখ-দন্ত হয়ে, বিনা আয়াসে নিজের পেটটা ভরতে চায়—খেটে খাবার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ সে একদিন আবিষ্কার করে যে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে মানুষকে সহজে ঘায়েল করা যায় আর একবার নর-রক্তের আস্বাদ পেলে তার সাধারণ খাদ্য হরিণ বা আর কোনও কিছু মশায়ের জিহ্বায় রুচিকর হয় না।

এই সব নরখাদক বাঘের দিকে ভাল করে চাইলেই দেখা যায়, গায়ের লোম উঠে গেছে—চর্মরোগে বেচারীর দেহে শান্তি নেই। ঠিক বিড়াল যেমন চড়ুই পাখির দিকে ছোঁ পেতে বসে থাকে, এই সব অকর্মণ্য বুড়ো বাঘও তেমনি পথের ধারে ছোটখাটো ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করে—আর হাটফেরতা লোক, বা যারা কাছে ভিতে চাষবাস করতে আসে, একটু নিরিবিলি পেলেই বাঘ তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে দু-একদিনের খোরাক সংগ্রহ করে।

কৃষক ভোরে উঠেই যায় মাঠে তার লাঙ্গল বলদ নিয়ে, একটু পরেই, তার স্ত্রী কিংবা মেয়ে 'নাস্তা' নিয়ে আসে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় গা ছমছম করে, এদিকওদিক ভয়ে ভয়ে সে চাইতে থাকে, তার পরেই, ও রে বাবা রে, মলাম রে, গেলাম রে আর্তনাদ—ব্যস চারদিকে হইহই করে উঠল সবাই—বাঘে নিয়েছে, সামাল সামাল, ভাইরা।

গাঁয়ের লোকেরা দল বেঁধে কখনো কখনো টিন বাজিয়ে আগুন জ্বেলে বাঘ তাড়ায়, আবার কখনো বা ব্যাঘ্রদেবতার কৃপার উদ্রেক করতে পুজো দেয়—সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের দেবতাকে পুজো করার কথা কে না জানে? পোষ মাসের দিকে উড়িষ্যার জঙ্গলেও অরণ্যচারীদের আত্মরক্ষার জন্যে বাঘের পুজো দেওয়ার ব্যাপার তো স্বচক্ষেই দেখে এসেছি।

সেবার আমরা গিয়েছিলাম উত্তরী মুল্লুকে। ওখানকার জঙ্গল নাকি খুব বড় আর গভীর। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট্ট নদী জয়ন্তী এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। রেলস্টেশনের গায়েই পাথর ভেঙে স্তূপাকার। খানিকটা পশ্চিমে গেলেই বস্তি—সবই পাহাড়ী লোক। তাদের জীবিকা গরু মোষ পালন, মাখন বিক্রি করা, হাঁস মুরগির ব্যবসা, আর পাহাড়ের ওপার থেকে কমলা লেবু আমদানি করে রেলে চালান দেওয়া! চাষ-বাস আছে, তরিতরকারির বাগানও দেখা যায়, কষ্ট যা কিছু, সে হল জলের। নদী বেশ কিছুটা দূরে, তাই পাহাড়ী ঝোরার জলই তাদের গৃহস্থালীর ভরসা। পর পর কয়েকটি বস্তি—চারদিকেই জঙ্গল। শুধু পুরুষরা নয়, মেয়েরাও সঙ্গে ভোজালি রাখে।

আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে একটা জায়গায় তাঁবু খাটালাম। আমি, আমার দুই বন্ধু সুধীর আর অনন্ত আর আছে আমার combined hand তিলকধারী। রোজ ভোরে উঠেই ফোটা তিলক কাটতো বলে এই নামটাই তার চালু হয়েছিল! দু'-চারজন করে গ্রামবাসী এসে আমাদের উদ্দেশ্য জানতে চায়। সন্দেহ করে, হয়ত কোনও মতলব নিয়ে আমরা সেখানে গিয়েছি। তাদের সঙ্গে খুব খানিকটা আলাপ-পরিচয় করে, অবশ্য ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে আমাদের কিছুটা দখল ছিল, সিগারেট বিলিয়ে, তাদের কাছে কমলা লেবু, দুধ, মাখন, সবজি ইত্যাদি কিনে, তাদের মনে

আমাদের সম্বন্ধে খানিকটা বিশ্বাস জন্মানো গেল। ক্রমে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করলাম। তাদেরও উৎসাহের সীমা নেই—শের তাদের দুশমন! দলপতি সসম্ভ্রমে জানায়—গ্রামের জমিদারের বহুত হাতি আছে, দরকার হলে সে যোগাড় করে আনতে পারে।

আমাদের শিকারের জায়গাটা নির্দিষ্ট হল নদীর ওপারে। খরস্রোতা নদী —জল অল্প হলেও, দুরন্ত বেগ, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত। আমরা পাঁচ পাঁচটা হাতি নিয়ে রওনা হলাম। একটা মাদী হাতি কিছুতেই জলে নামতে চায় না—মাহুত যতই বোল ছাড়ে মাথায় ডাঙ্গশ মারে, স্থাণুর মত হাতিটা দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে দুটো দাঁতাল হাতির পাহারায় মাদী হাতিটাকে মাঝখানে রেখে কোনও রকমে নদী পার হওয়া গেল। ভিজে স্যাঁতসেতে তরাই অঞ্চলের মাটিতে হাতির পা ডুবে যায়— তাদের সমস্ত শরীর দুলতে থাকে আর আরোহীদের সঙ্গীন অবস্থা—হাওদার দড়ি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে অতিকষ্টে তারা শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে।

নদীটি এঁকেবেঁকে ক্রমে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে। পার হয়েই আমরা দেখলাম, সামনে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ, সেটা না কি ধানের জমি। গত বছর ফসল উঠেছে ; এ বছর বাদ দিয়ে আগামী বছরে চাষ হবে। আশেপাশে ছোট ছোট গ্রাম, এ অঞ্চলে তাদের নাম বস্তি। দূরে দেখা যায়, পাহাড়ের ওপর শালের জঙ্গল, তার গা বেয়ে মেঘ উড়ে যাচ্ছে। কোথাও বা কুয়াসা গাছের পাতায় পাতায় একটা অস্পষ্ট আবরণ সৃষ্টি করেছে, পাহাড়ের চূড়া যেন কী ইঙ্গিত করে আমাদের বলতে চায়—এসো, এসো, আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাও রহস্যেঘেরা পর্বত-ঘেরা-অরণ্য অঞ্চলে।

কিছুটা এগিয়ে যেতেই, মাঠের এক পাশে একটা গরুর লাশ দেখা গেল—হাড়-পাঁজরাগুলোই শুধু পড়ে আছে। একপাল শকুন আকাশে ঘুরপাক খেয়ে অপেক্ষা করে—আমরা পাশ কাটিয়ে চলে গেলেই আবার তারা ভোজনপর্বে বসে যাবে। দু-একটি শেয়াল ছুট করে বেরিয়ে গিয়েই চিৎকার শুরু করে দিল। আমাদের মধ্যে একজন তার বন্দুক বের করে সেই জানোয়ারের কালোয়াতি এ জন্মের মত শেষ করে দিতে চায়।

হাত ধরে তাকে থামিয়ে দিলাম। যে কাজে এসেছি—তার মধ্যে না যাওয়া পর্যন্ত বন্দুক ব্যবহার করা চলবে না।

গ্রামের কাছে পৌঁছতেই একটা বাড়ি থেকে একদল হাড়-জিরজিরে ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এল। তাদের চোখে কৌতূহল আর বিস্ময়, অবাক্ হয়ে তারা আমাদের দেখছিল—হয়ত তাদের কিছুটা আশঙ্কাও হয়ে থাকবে। কিন্তু যখন আমাদের স্থানীয় সঙ্গীরা তাদের বুঝিয়ে দিলে, তারা বুঝি আশ্বস্ত হয়েই বাড়ির মধ্যে ছুটে গেল। কারণ, একটু পরেই একটি বৃদ্ধ লোক, তার কলাইকরা সানকিতে কয়েকটা কমলা লেবু নিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালে। দেখলাম, গরিব হলেও আতিথেয়তায় তারা পিছিয়ে নেই।

আমরা হাতিগুলোকে এক সঙ্গে জুটিয়ে, হস্তিপৃষ্ঠেই আমাদের শিকার সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করে নিলাম। গ্রামের মাতব্বরকে জিজ্ঞেস করি—মানুষখেকো বাঘের খবর কি?

লোকটা বোধ হয় নিরেট—কারণ সে যা বললে, তাতে আমাদের কোনও সুবিধাই হয় না। ভাগ্যক্রমে, গ্রাম্য চৌকিদার সেই পথেই চলেছে থানায় হাজিরা দিতে। তাকেই জিজ্ঞাসা করি—কী হে জমাদার সাহেব, বলি, বাঘের খবরটবর কিছু রাখো কি?

গ্রাম্য চৌকিদারকে জমাদার বলায় তার গৌরব কতখানি বেড়ে গিয়েছিল, বলতে পারি না, সে কিন্তু দন্তরুচিকৌমুদী বিকশিত করে হাত-পা নেড়ে সংবাদ দিলে যে মাত্র আগের দিনই একটা বুড়ো ঘাস কাটতে এসে বাঘের পেটে গিয়েছে। সে এমন কথাও বললে যে হুকুম হলে, জায়গাটাও সে দেখিয়ে দিতে পারে।

আর কালবিলম্ব না করে, তাকে হাতির ওপরে আমার পাশেই বসালাম। হাওদার ওপর ভাল হয়ে বসে, বন্দুকে টোটা পুরে, এমনভাবে আমরা এগিয়ে যাই যেন আর একটু পরেই সেই ভীষণকায় মানুষখেকো বাঘটা আমাদের সামনে সশরীরে দর্শন দেবে। চলতে চলতে চৌকিদারপ্রবরের কাছে আরও জানা গেল, বহুদিন ধরেই বাঘটার অত্যাচার চলছে, কিন্তু কী করা যায়। গ্রামে একটা বন্দুক নেই, তার তো একখানা লাঠি মাত্র সম্বল; নইলে বাঘের চোদ্দপুরুষেরও ক্ষমতা ছিল না একদিনের

সঙ্গে সঙ্গেই সুধীর অনন্তের বন্দুকও গর্জন করে ওঠে । পৃঃ ১১৮

রাজকীয় চলনভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে একটা ভাব,—আঃ, কী জ্বালাতন ! [পৃঃ ১১৪

বেশী এ গ্রামে বেঁচে থাকবার। থানাদারকে কতবার সে জানিয়েছে কিন্তু সে কথা শোনে কে ?

বাঘের অত্যাচারের কিছুটা পরিচয় আমরাও পেলাম। গ্রামবাসীদের অবস্থা খুবই খারাপ, তবুও চাষবাস কিছুই হয়নি কেন ? প্রশ্ন করতেই চৌকিদার বললে—কী করে হবে, তাই বলুন ? কে আসবে বাঘের হাতে প্রাণ দিতে ? দেখুন না, ছেলেপিলেরাও ভয়ে কুঁকড়ে আছে, খেলাধুলা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই চৌকিদার আমাদের থামতে বললে। অল্প দূরে কতকগুলি ঝোপ দেখা যায়—তার পাশেই একটা খাড়ি। দ্রুত হারমোনিয়ম বাজাবার ভঙ্গীতে আঙুল চালিয়ে চৌকিদার সেদিকেই নির্দেশ করে বললে—বাঘ ওইখানেই আছে।

ঠিক সেই সময়েই আমাদের বাহনদের মধ্যেও একটা আলোড়ন দেখা গেল। মাদী হাতিটা হঠাৎ শুঁড় তুলেই একটা গুড়গুড় আওয়াজ তুলছে। সঙ্গে সঙ্গেই

অন্যান্য হাতিগুলোও তার সঙ্গে যোগ দিলে। মাহুতেরা ডাঙ্গশ দিয়ে আঘাত করেও যেন হাতিগুলোকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তাদের বক্রদৃষ্টিতে সাবধানী ইঙ্গিত।

আমার কানের কাছে তার হাঁড়িপানা মুখটা এগিয়ে এনে মাহুত ফিসফিস করে বললে—নিশ্চয়ই বাঘ আছে, হুজুর !

আমার কিন্তু মোটেই বিশ্বাস হয়নি। তেমন জঙ্গল কোথায় ? এর মধ্যে যে একটা বনবিড়ালও নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে না।

খাড়ির পাশেই কতকগুলি ঝোপ—কাছাকাছি আসতেই একটি হাতি বিকট চিৎকার করে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বুড়ো, গায়ের লোমওঠা বাঘ ঝোপের ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠেই, ধীরে ধীরে মাঠের এক পাশ দিয়ে নেমে গেল, যেন কোনও কিছুই তার গ্রাহ্যের মধ্যে আনবার প্রয়োজন নেই। চোখের সামনে ব্যাপারটা দেখেও, নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। এও কি সম্ভব ? বাঘ কি এমনি বেপরোয়া চলতে পারে ? যেন বিরক্ত হয়েই সে আর এক আস্তানায় চলেছে। তার রাজকীয় চলনভঙ্গীতে যেন ফুটে উঠেছে একটা ভাষা,—আঃ, কী জ্বালাতন !

কিন্তু ওই যে জানোয়ারটা সামনে দিয়ে হেঁটে যায় সে তো আর ভেলকিবাজি নয়—জলজ্যান্ত একটা বাঘ ! কাজেই আমাদের মধ্যেও রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। বন্দুক নিশানা করেই ধাঁ করে একটা গুলি, সঙ্গে সঙ্গেই সুধীর অনন্তের বন্দুকও গর্জন করে ওঠে।

বাঘটা পড়ে গেল—কী আশ্চর্য, একটু হাত-পা ছুঁড়লো না, একটাও গর্জন নেই—শরীরটা একবারও দুলে উঠলো না ! এও কি বাঘের শয়তানি ? মানুষখেকো বাঘগুলো প্রায়ই খুব চালাক হয়, তবে কি ঘাপটি মেরে পড়ে আছে,—আমাদের কাছে পেলেই আক্রমণ করবে ? কিন্তু, এমন তো মনে হয় না ! গাঢ় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে গলগল করে তার সামনের পা থেকে যেখানে গুলির আঘাতে বেশ খানিকটা খাল হয়েছে।

অনন্ত সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠে—বেটা পটল তুলেছে।

সুধীরের গুলিটা বাঘের ধার ঘেঁষেও যায়নি—তার কণ্ঠেই সব চাইতে বেশী বিক্রম। তারপর সুচিন্তিত মন্তব্য—আরে ছোঃ, মিছেমিছি একটা প্রাণিবধ হয়ে গেল। ওটা কি বাঘ ? বিড়াল বললেও চলে।

গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটা পড়ে গেল। [পৃঃ ১১৪

অনন্তর চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। হতাশ হয়ে বলে ওঠে,—যাই হোক না কেন? চামড়াটা কোনও কাজে লাগবে না, এই যা আফসোস।

তিলকধারী বহুদিন আমার কাছে থাকায় নিজেকে আমার গার্জিয়ান বলেই সে মনে করত ; এবার তিনিও একটি বোল ছেড়ে দিলেন,—বহুত আচ্ছা কাম হুইয়েসে বাবু, এবার ঘরকে চালিয়ে। ওহি শেরমে কোই কাম নেহি হ্যায়।

নরখাদক বাঘের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সংবাদটি যেন প্রবল বাতাসে আগুনের মতই মুহূর্তে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে মেয়ে-পুরুষ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসে। আমরাও পাঁচটা হাতিকেই বাঘের চারদিকে গোল করে সাজিয়ে নিলাম।

তিলকধারীকে বলি—তোমার হাতিটাকে নিয়ে বাঘের কাছে এগিয়ে যাও—মাহুত বলছে, ওটা নতুন হাতি, ওকে একটু তালিম দিতে হবে, বাঘের গন্ধটা যেন টের পায়।

বাঘটা মরে গিয়েছে, কাজেই মহা আনন্দে তিলকধারী নিজেই হাতির কানের কাছে মুখ নিয়ে উৎসাহ দেয়। হাতিটা প্রথমে কিছুতেই চলতে চায় না, শেষে মাহুতের চেষ্টায় সেটা বাঘের কাছাকাছি আসতেই, তিলকধারীর চোখ কপালে উঠে গেল।

—আরে, শেরঠো মরিয়েসে নাই বাবুজী—জিন্দা হ্যায়—সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায়—তার এই চিরাভ্যস্ত প্রচলন শুনিয়ে দিয়েই, সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে হাতির ওপর থেকে গড়িয়ে একেবারে মাটিতে!

আমি সবে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছি, তিলকধারীর চিৎকার শুনে বন্দুক হাতে নিয়েই দেখি যে, আমার সুযোগ্য অনুচর ধপ করে মাটিতে পড়ে যেতেই সেই বাঘটা তার একজোড়া সবুজ চোখের দৃষ্টি মেলে যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো—তারপর বিরাট একটা হাঁ করে সামনের সেই হাতির পায়েই বসিয়ে দিল তার মরণ কামড়। কশ বেয়ে ফেনা ঝরছে, ঘন ঘন নিশ্বাসে সমস্ত শরীরটা ক্রমাগত ফুলে ফুলে দুলে ওঠে—এক পাশে কাত হয়ে সে তার দাঁতের গোড়া পর্যন্ত হাতির পায়ের মাংসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ধুঁকতে লাগল।

অসহ্য যন্ত্রণায় সেই হাতিটা এমন বিকট চিৎকার করে ওঠে যে সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য হাতিগুলোও যেন ক্ষেপে উঠল। তখন তাদের সামলানো দায়। আমি দ্বিতীয়বার গুলি করাতেই বাঘটা একবার নড়ে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল—কিন্তু তার কামড় সে তখনো ছাড়েনি।

বহু চেষ্টায় বাঘের দাঁত থেকে হাতিটাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হল, কিন্তু সেই কামড়ে ক্ষতস্থান বিষিয়ে ওঠায় তিন দিনের মধ্যেই হাতিটা মরে গেল। ফলে হাতির মালিককে বেশ কিছু গচ্ছা দিয়ে তবে রেহাই পেলাম।

তাই বলছিলাম, গুলিখাওয়া বাঘকে বিশ্বাস নেই—বিশেষ করে যখন সে মরতে বসেছে। সেদিন, সেই তরাই অঞ্চলে যে শিক্ষা পেয়েছিলাম, পরে তার সদ্ব্যবহার করে বহু বিপদের হাত থেকেই বেঁচে গিয়েছি।

গল্প শেষ হতেই বন্ধুবরের পিঠ চাপড়ে বলি—সাবাস, ভাই সাবাস! তুমি তো দেখছি একটি বর্ণচোরা আম!

বিষি মানুষ নয়, বাঘ

সেদিন আমার লালগোলার বাড়ির বৈঠকখানাতেই নাগা পাহাড় নেমে আসে আর কি ?

বর্ষণমুখর শ্রাবণের সকাল বেলা। ভোরের গাড়িতেই অতিথির সমাগম। আর কেউ নয়, আমারই আবাল্য সুহৃদ মেজর অর্জুন সেন। সঙ্গে তার সহকারী ক্যাপ্টেন দীক্ষিত আর আছে একাধারে ভৃত্য, সচিব ও সখা শ্রীমান্ ভণ্টু।

আমার অনেকদিন আগের শিকার করা একটি বাঘের চামড়া ট্যান্ হয়ে এসে দেয়ালে টানা দেওয়া আছে, সেদিকে চোখ পড়তেই ক্যাপ্টেন দীক্ষিতের অনুসন্ধানী দৃষ্টি, যার অর্থ—এখানেও শিকারী ?

অর্জুন সেন তার ডোন্ট-কেয়ার গোঁফজোড়াটি চুমড়ে নিয়ে দাঁতের ফাঁকে একটু হাসি ছড়িয়ে দিলে, তোমাকে বলা হয়নি, আমরা যাঁর অতিথি হয়েছি তিনিও একজন মস্ত...

—থাক আর সার্টিফিকেট দিতে হবে না!

ক্যাপ্টেন দীক্ষিতের আদি নিবাস লক্ষ্ণৌ—একটি বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে খাঁটি বাঙালী বনে গিয়েছেন।

সোৎসাহে বলে ওঠেন—তাই নাকি? ভালই হল! ওঁর কাছেও অনেক কিছু জানা যাবে। আচ্ছা, এ বাঘটা কি সুন্দরবনের?

—আজ্ঞে না। বেঙ্গল রয়েল টাইগার হলেই যে বাঙলার হবে, তার কোনো মানে নেই। বাঙলার বাইরেও চারদিকেই ছড়িয়ে আছেন এঁরা—সুযোগ-সুবিধা হলেই দর্শন দিয়ে থাকেন।

—আচ্ছা, এই যে বাঘটা আপনি মেরেছিলেন, কী রকম সিচুয়েশনে বলুন তো? নিশ্চয়ই খুব সেন্‌সেশন্যাল্—খুব থ্রিলিং!

—বাঘ একটা মেরে ফেললেই যে খুব লোমহর্ষণকারী কাণ্ড হবে—সে কথা কে বলেছে? অবিশ্যি, ওই যে থ্রিল, সেন্‌সেশন্ কী সব বলছিলেন না, যদি তার আওতায় ফেলে গল্প বানিয়ে দেওয়া না হয়।

ক্যাপ্টেন দীক্ষিতের চোখ দুটো একটু বড় হয়েই আপন কোটরে ঢুকে গেল।

—এসব গুলো আমরা শুনেও থাকি, বলেও থাকি, কিন্তু যে শিকারে তীব্র উত্তেজনা থাকে না, বা হঠাৎ গিয়ে মেরে আনা যায়, তার মধ্যে আকর্ষণ কিছু আছে কী?

অর্জুন সেনের উচ্চহাস্য। বন্ধুকে ঠাট্টা করে বলে—তুমি কি মনে কর দীক্ষিত, রিজার্ভ ফরেস্টে শিকার মজুত করে, হাতি ঘোড়া, লোক লশকর নিয়ে, গণ্ডা কয়েক বাঘ চিতেবাঘ মেরে আনাটাই শিকারের নমুনা?

—তা কেন হবে? আমি তো নিজের চোখেই দেখেছি, একটা নরখাদক গুণ্ডা বাঘের পেছনে দিনের পর দিন তুমি কেমন ছুটে বেড়িয়েছ। কিছুতেই বন্দুকের পাল্লায় আনা যায় না—

বাধা দিয়ে প্রশ্ন করি—বটে! কোথায় বল তো? এমন একটা শিকারের পেছনে লেগে থাকাটাই যে দস্তুরমত থ্রিল?

—যা বলেছ ভাই। নাগা রাজ্যে শুধু বাঘেরই 'পাগ্ মার্ক' দেখে দিনগুলো কেটে গেল। রাত জাগার কথা আর নাই বা বললাম!

—ছেঁড়া কাঁথা সেলাইয়ের মত টুকরো টুকরো কথা শুনতে চাই না। আগে ফাস্ট ব্রেক কর—ব্রেকফাস্ট চলুক, সঙ্গে সঙ্গে তোমার গল্পও চলতে থাকুক।

অর্জুন—তোমার মনে আছে দীক্ষিত, সেই শেষ দিনটির কথা ?

দীক্ষিত—তুমি বল কী মেজর ? মনে থাকবে না ? বাইশে এপ্রিলের সেই ভয়ংকর দিনটির কথা কি ভোলবার ? পাহাড়ে পাহাড়ে একটা নরখাদকের পেছনে ছুটে বেড়ানো যে কতখানি বিপজ্জনক, তার জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী আমি নিজে।

বেয়ারা খবর দিলে, সব প্রস্তুত।

ছোট হাজরির সঙ্গে সঙ্গে বাঘের বড় হাজরির কথাও চলতে থাকে।

আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মেজর সেন ক্যাপ্টেন দীক্ষিতকে বলে—তোমার কাছে তো সব কথাই শুনেছি। গল্পটা এঁকেও শুনিয়ে দাও !

ওদিকে অর্জুন সেনের হাত ও মুখ সমান তালে চলতে থাকে—এদিকে ক্যাপ্টেনও অনর্গল বকতে থাকেন।

—গল্প নয়, জাজ্বল্যমান ঘটনা। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের জরুরী পত্রাঘাতে তখন আমাকে কয়েকদিনের জন্যে ডেপুটেশনে আসতে হয়েছে। রেঞ্জার সাহেব এক ইওরোপীয়ান···একাই থাকেন···আমার সঙ্গে বেশ জমে গেলেন। তাঁর সঙ্গেই রোজ এদিকওদিক ঘুরে বেড়াই। জঙ্গলের পথঘাট চিনি না। একদিন বিকেলে একাই বের হয়েছিলাম। হাতে ছিল আমার হ্যাণ্ডব্যাগ আর একখানা গুপ্তি। ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেলি। তাই তো, এখন কী করা যায় ? সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসে—কেমন করে ফরেস্ট অফিসের বাংলোয় ফিরে যাই ? একটা শালগাছে হেলান দিয়ে ভাবি, এই নির্জন অরণ্যে এমন কেউ কি আছে যে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করবে, পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ? কিন্তু আমার কপালে কোনও কপালকুণ্ডলা জুটলো না, তার বদলে দেখা দিল এক ন্যুব্জদেহ কুব্জপৃষ্ঠ বুড়ো কাঠুরে, হাতে টাঙ্গি, মাথায় কাঠের বোঝা।

তাকে জিজ্ঞেস করি—ফরেস্ট অফিসের বাংলোটা কোন্ দিকে বলতে পারো ?

সে যেন ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল—এমনি তার মুখ চোখের ভাব।

—সে কী সাহেব, সে তো অনেক দূর ! আজ এই আঁধার রাতে যাবেন কেমন করে ? বাঘ-ভালুকের ভয় নেই ?

—তাই তো, রাত কাটাই কোথায় ?

সেও তখনি আশ্বাস দেয়—কেন সাহেব, আমার ডেরায় কি ঠাঁই নেই ? একটা আলাদা কুঠরী আছে, সেখানেই থাকবেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলি—বেশ, তবে চল।

সে একটু ইতস্ততঃ করে জানতে চাইলে—সাহেবের খানাপিনার কী হবে ?

তার সমস্ত ভাবনাচিন্তাকে নস্যাৎ করে দিলাম—তার জন্যে কিছু ভাবতে হবে না। রাত কাটানোই প্রধান সমস্যা।

বুড়োর সঙ্গে কিছুদূর যাওয়ার পরই একটা ঘর দেখতে পাওয়া গেল। বড় শাল গাছের খুঁটির অনেকটা উঁচুতে কাঠের পাটাতন দেওয়া ঘর যেমন এই সব পাহাড়ী জংলা জায়গায় তৈরি করে। একটা খুব সরু কাঠের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গিয়েছে—কোনো রকমে একটা মানুষ কাত হয়ে উঠতে পারে। নীচে সম্পূর্ণ ফাঁকা।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। দুখানা ছোট বড় কামরা, মাঝে কাঠের তক্তা দিয়ে পার্টিশন করা। ছোট ঘরখানায় আমার থাকার ব্যবস্থা করে বুড়ো সপরিবারে বড় ঘরখানায় আস্তানা নিলে। ঘরের মাঝখানে একটা জায়গায় আগুন জ্বেলে ওরা সব চারদিকে ঘিরে বসেছে। পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে টুকটাক গল্প-গুজব শুনতে পাওয়া যায়। শয্যা নেই। চটবিছানো মেঝের ওপর আমার হাতের ছোট ব্যাগটি মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ি। চোখে ঘুম নেই। এই রকম পরিস্থিতিতে কখনো পড়িনি। শুয়ে শুয়ে এলোমেলো কত কথাই না চিন্তা করি।

প্রহরখানেক রাত। পাশের ঘরে বুড়ো-বুড়ী ও তাদের জোয়ান ছেলেটির খাওয়া-দাওয়া শেষ···এখন শয়ন পর্বে ব্যস্ত—হঠাৎ তাদের কলগুঞ্জন থেমে গেল।

ব্যাপার কী ? পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করি। ঘরের মধ্যে অন্ধকার—আগুনের অস্পষ্ট আলোয় কিছুই ভালো দেখা যায় না। হঠাৎ একটা কী যেন ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল—আর কাঠের ঘরখানাও মড়মড় আওয়াজ করে দুলতে থাকে। আমি উঠে বসলাম।

যে ঘরে আমি, তার দরজা ওপাশ থেকে খিল দেওয়া ; কাজেই কোন শোরগোল না করে আমি সেই পার্টিশনের ফাঁকে চোখ দিয়ে চুপ করে বসে থাকি।

বাঘটা হঠাৎ ছেলেটির ঘাড়েব ওপর লাফিয়ে পড়ল।

হঠাৎ দেখি, কী যেন একটা জানোয়ারের মত গুঁড়ি মেরে ঘরের ভেতর ঢুকল। আগুনের আলো তার গায়ে পড়তেই দেখলাম, একটা ডোরাকাটা বিরাট বাঘ! চিৎকার করে উঠবো কী, ভয়ে আমার গলা দিয়ে কোনও আওয়াজই বের হয় না। বুড়ো-বুড়ী আর সেই জোয়ান ছেলেটি ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। বাঘটা হঠাৎ সেই ছেলেটির ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে এক কামড় দিয়েই বাইরে টেনে নিয়ে গেল—তার পরই মাটিতে লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল হাড় চিবানোর মটমট শব্দ। এদিকে বুড়ো আর বুড়ী দুজনেই যেন পাষাণ মূর্তি—জ্ঞান আছে কি না সন্দেহ। দরজায় খুব জোরে জোরে ধাক্কা

দিলাম—কিন্তু খুলে দেবে কে ? এদিকে আমার কাছেও বন্দুক নেই, শুধু একখানা গুপ্তি হাতে বাঘের সামনে দাঁড়ানো বোকামি। আমারই চোখের সামনে এরকম একটা ভীষণ ব্যাপার হয়ে গেল ! কিন্তু একটা কাঠের ঘরে কাঠ হয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আবার কিসের শব্দ ? পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে দেখি—সেই নরখাদক বাঘটা আবার ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। বুড়োর চোখে মুখে একটা পাগলের মত ভাব—বুড়ী এককোণে মূর্ছিতা। বাঘটা এবার বীরের মত হেলতে দুলতে গিয়ে বুড়ীকেই আক্রমণ করলে। হঠাৎ বুড়ো তার টাঙ্গিখানা নিয়েই বাঘের কোমরে আঘাত করে, কিন্তু সামলাতে না পারায় সেখানা তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। বুড়ো তখন আগুনের মধ্য থেকে একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে বেপরোয়া বাঘের পিঠে আঘাত করতে থাকে, কিন্তু সেই গুণ্ডা বাঘটার যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে সে বুড়োকে এক থাবার ঘায়ে ধরাশায়ী করেই বুড়ীকে নিয়ে চম্পট।

চোখের সামনে দু'দুটো মানুষের এই শোচনীয় পরিণতি দেখে আমি যেন হতভম্ব হয়ে পড়ি। বাকী রাতটা জেগেই কেটে গেল। ভোরবেলায় আমার চেঁচা-মেচিতে বুড়ো চোখ মেলে বসল বটে, তারপর দরজার খিলটা খুলে দিয়েই পাগলের মত চিৎকার করে ছুটে বের হয়ে গেল—হাঃ হাঃ হাঃ, বাঘ—বাঘ—আয়—কত খাবি আয়, আমাকেই বা ছেড়ে দিলি কেন, বাপ ?

অর্জুন সেন বলে ওঠে :

—এই বাঘটির কথাই আজ তোমাদের বলব। দীক্ষিতকে শিকারে দীক্ষিত করার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু সে গুড়ে বালি ! এইসব জলজ্যান্ত বাঘের কাণ্ডকারখানা দেখেও ওর কিস্যু হল না।

দীক্ষিত অপ্রতিভ তো হলই না—বরং অর্জুন সেনকেই তাড়া দেয়—ঢের হয়েছে, এই বাঘটাকে কেমন করে খতম করলে তারই ইতিহাস্ বল।

সকলের চা-পান শেষ। মেজর সেন সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে কথার এঞ্জিন চালিয়ে যায়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে একটা সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হয়নি বলেই সেখানে

আমাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। উত্তর কাছাড়ে নাগাভূমির প্রান্তদেশে এই অঞ্চলটি। একটি নরখাদক বাঘের কথা প্রায়ই কানে আসে। কাজের ফাঁকে এমন ফুরসত হয় না যে তখনি বেরিয়ে পড়ি। শোনা গেল বাঘটা গুণ্ডা প্রকৃতির—জোয়ান। যেমন জাঁদরেল, তেমনি সেয়ানা- -ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

এ কী রকম? বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলেই বাঘ নরখাদক হয়; অথর্ব হয়ে যখন জঙ্গলের পশুর পেছনে ধাওয়া করতে পারে না, তখনই সে সুযোগ-সুবিধামত মানুষের যাওয়া-আসার পথে ওত পেতে বসে থাকে ও শিকার নিয়ে চম্পট দেয়। এ বাঘটা কি তাহলে নিয়মের ব্যতিক্রম? নিজে নিজেই ডিগ্রী ডিসমিস করে দিলাম—সম্ভবতঃ এর বাপ-মাও ছিল নরখাদক, তাই বাচ্চা বয়সেই সেও নরমাংসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে—অন্য কোনও পশুর মাংস তার মুখে রোচে না।

অনুযোগ করে বলি—নান্দীপাঠেই যদি ঘণ্টা কাবার কর, আসল কথাটা শুনব কখন?

স-চিৎকারে ভল্টুর ডাক পড়তেই, তার নাটকীয় প্রবেশ—একটা স্যালুট দিয়েই মিলিটারী কায়দায় দাঁড়িয়ে গেল।

অর্জুন সেনের জিজ্ঞাসা—কী যেন সেই বাঘটার নাম?

ভল্টু তার মাথায় একটা ঘুঁষি মেরে যেন বুদ্ধির কপাট খুলতে চায়, তারপর বলে—সেটার নাম ছিল পিসী!

—তোর মাথা, মাসী পিসী নয়—বিষী—এতক্ষণে মনে পড়েছে।

বাধা দিয়ে বলি—নামের গবেষণা করে লাভ নেই।

—আছে বইকি! বিষী এমন একটা জাঁদরেল জানোয়ার, যার নরখাদক জীবনের একটা বিরাট পর্ব আছে। কিছুটা দীক্ষিতের কাছে তো শুনেছ!

অর্জুন সেন তার কোমরের বেল্টটা টাইট করে নেয়, তারপর চোখদুটি বাইরে মেলে দিয়ে বলতে থাকে:

—আমাদের ক্যাম্প করার এক সপ্তাহের মধ্যেই খবর পেলাম, একটা নরখাদক বাঘের অত্যাচারে চারদিকে হাহাকার পড়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি মানুষের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। বাঘটা নাকি ভয়ানক ধূর্ত—পলক না ফেলতেই অদৃশ্য হয়ে

যায়। আরও শুনলাম, শুধু যে নরখাদক তাই নয়, খিদের জ্বালায় গরু বাছুর ছাগল মোষ যা সামনে পায়, তাই মেরে চলে।

উপর্যুপরি কয়েকটা খবর পেয়ে স্থির করলাম, আর দেরি করা উচিত নয়। একমাত্র সঙ্গী ভল্টু,—তখনও দীক্ষিত এসে পৌঁছয়নি।

ঠিক এমনি সময় এক দুপুরবেলা এমন একটা খবর এসে পৌঁছল যে আমাদের আর চুপ করে বসে থাকা চলল না। ভল্টু আর আমি দুজনে দুটো বন্দুক নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে সেই সংবাদদাতা—জাতে পাহাড়ী, হাতে টাঙ্গি। পথে গল্প জুড়ে দেয়—বাঘটা শয়তান সাহেব, এমন চালাক যে যেখানে তার শিকার পড়ে আছে, সেখানেও সে সহজে আসে না—কী জানি যদি কেউ ফাঁদ পেতে রেখে দেয়।

—বেশ. একবার চল দেখি, যেখানে 'কীল' হয়েছে, সেদিকেই যাওয়া যাক।

এই অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তোমাদের কাশ্মীরকেও হার মানিয়ে দেয়। নতুন বসন্তে স্থানটি ভারী সুন্দর দেখায়। সবুজ ঘাসের নরম ভেলভেট পাতা, এখানে ওখানে দুচারটে বড় বড় গাছ। পাহাড়গুলো একটার পর একটা ঢেউএর ওপর ঢেউ তুলে আকাশের কোলে মিশে গিয়েছে। মাঝে মাঝে যে ফাঁকা জায়গাগুলো পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগই লম্বা ঘাসে ভরতি। ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর বাঁশের ঝোপও আছে। সেগুলো এত ঘন যে মাটির ওপর উপুড় হয়ে না পড়লে ঝোপের ভেতর দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। গ্রাম বলতে তেমন বিশেষ কিছু নেই—এখানে সেখানে আট-দশটি পরিবারের এক একটি বিচ্ছিন্ন বসতি।

—ওই দেখ, আবার কাব্যিভূত তোমার ঘাড়ে চেপে বসল!

—এসব বলতে হয়; কাঠখোট্টার মত দু-চারটি কথায় ইতি করা চলে না। গেলাম—দেখলাম—শুইয়ে দিলাম, না হয় ফসকে গেল। নিদেন পক্ষে দু-চারটি লোক ঘায়েল, এই তো? ব্যস্—শিকার শেষ!

—হ্যাঁ, ঠিক তাই! ওই কাজগুলোর মধ্যেই আসল টেকনিক। বাকী সব কিছুই শিকারের অলংকার।

আর একটি সিগারেট টেবিলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে অর্জুন সেনের মন্তব্য:

—তাই অলংকার শুনতে হবে বইকি! স্থান, কাল, পাত্র চাই তো! বাধা দিও না, শুনে যাও। আমরা ক্রমে একটা পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছলাম। সেখানে পাহাড়টা যেন দুভাগে ভাগ হয়ে একটা লম্বা সুড়ঙ্গ-পথের সৃষ্টি করেছে। এক পাশ দিয়ে একটি সংকীর্ণ জলধারা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে যায়—তার পাশেই নরম মাটির ওপর বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেল।

খুব সন্তর্পণে এদিকওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে আমরা তিনজনে এগিয়ে যাই। সোজা সেই ফাটলের পথে নয়, ধার ঘেঁষে পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকি। প্রায় চার ফার্লং ওপরে উঠেছি—উঁকি দিয়ে দেখি, সেই ফাটলের একপাশে একটা জায়গায় কিছুটা জল জমে আছে আর তার পাশেই একটি মানুষের দেহ। বাঘটা নিশ্চয় এখানেই আছে অথবা এখনি আসবে, এই আশায় বন্দুক বাগিয়ে ধরে একটা গাছের আড়ালে আমরা তিনজন চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম—কিন্তু বাঘের দেখা নেই।

ক্রমে দিনের আলো মিলিয়ে যায়—সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। এভাবে এখানে আর থাকা উচিত নয়, অগত্যা ব্যর্থতার পর্বতভার বুকে নিয়ে ফিরে আসা ছাড়া উপায় কি?

ক্যাম্পে ফিরেই যাকে সামনে দেখতে পেলাম, সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু ক্যাপ্টেন দীক্ষিত। দীক্ষিত এককালে নামজাদা খেলোয়াড় ছিল—পোলোতে ওকে 'ফলো' করার মত আর একটি খুঁজে পাওয়া ভার। এখন মিলিটারিতে এসে ওসবে ইস্তফা। সুযোগ-সুবিধা পেলেই আমার কাছে আসে।

আমাকে অভ্যর্থনা করে দীক্ষিতের সহাস্য প্রশ্ন—কই, বাঘ কোথায়?

আমারও সংক্ষিপ্ত উত্তর—জঙ্গলে।

—সে তো জানা কথা। তবে খামকা ওর পেছনে দিনটা মাটি করলে কেন?

—কালই তোমায় টের পাইয়ে দেব।

দীক্ষিত সভয়ে প্রশ্ন করে—সে কী? আমাকেও টানবে নাকি?

—নিশ্চয়, নইলে বাঘে না খেলেও কুড়েমি তোমায় চিবিয়ে খাবে। ঠিক-সময়ে যখন এসেই পড়েছ, তখন একটা চান্স নিতে দোষ কী?

রাত্রে আর কোন কথাবার্তা নেই। নৈশ ভোজনান্তে শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়ি।

সেই একটানা ঘুম ভাঙল ভোর চারটেয়। ভোরের কাজগুলো চটপট সেরে নিলাম। ভল্টুকে তাগাদা দিতে হয় না—সে সব সময়েই তৈরী। এমন সময় পাশের গ্রাম থেকে কয়েকটি নাগাজাতীয় লোক এসে হাত-পা নেড়ে কী যেন বলতে চায়। নাগাদের ভাষা জানি না—কাজেই দোভাষীর শরণাপন্ন হলাম। সেই বুঝিয়ে দিলে—আজ খুব ভোরেই একটা স্ত্রীলোককে বাঘে নিয়েছে। মাঠে নাস্তা নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময়—

ভোরে উঠেই নারীহত্যার খবর পেলাম—এটা দুঃসংবাদ না সুসংবাদ।

সে যাই হোক, তখুনি তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়া গেল।

বাঘটা যেখানে মারী করেছে, আমাদের গতি যে সেই দিকেই এটা না বললেও চলে। নাগারা জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললে—জাতভাইরা মৃতদেহটা কবর দেবে বলে তুলে নিয়েছে।

শুনলাম, এদের নিয়ম নাকি, বাঘ কীল করলেও তারা শবদেহ কুড়িয়ে নিয়ে যায়। কবর না দিলে নাকি তার আত্মারও মৃত্যু হয়—নাগাদের এই বিশ্বাস। এই তথ্যটি পরিবেশন করেই তাদের প্রস্থান।

মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ায় বাঘের মন-মেজাজ নিশ্চয়ই ভাল থাকার কথা নয়। তার ওপর আন্দাজে সেই জঙ্গলের মধ্যে আমরা তিনটি প্রাণী—বাঘের খোঁজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো খুবই বিপজ্জনক। কারণ কোন্ ঝোপের আড়ালে থেকে বাঘটা কখন যে আমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে, তার ঠিক নেই। এর মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই—আছে শুধু দুঃসাহস। কাজেই ফিরে যাওয়াই সিদ্ধান্ত করি।

কিন্তু মানুষ তার নিজের প্রভু নয়। কার্যকারণে তার ইচ্ছা ভাঙে আর গড়ে। আমরা ফিরে যেতে চাইলেও যাওয়া হল না। হঠাৎ ও-পাশের একটা গ্রাম থেকে হইহল্লা উঠতেই বোঝা গেল, আবার গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে।

দুজন নাগা দৌড়ে এসে খবর দিলে, বাঘ আবার একটা লোককে ঘায়েল করে ঘাড়ে তুলে নিয়েই কোথায় যে ঘাপটি মেরে বসে আছে, কোনো পাত্তা নেই। একজন

একজন নাগা অস্ত্রটি উর্ধ্বে তুলে ধরে ঘোষণা করে—যদি বাঘের দেখা পাই···

নাগা ধারালো অস্ত্রটি উর্ধ্বে তুলে ধরতেই সূর্যকিরণে সেটা ঝলমল করে ওঠে। লোকটি স্ফীতবক্ষে সদম্ভে ঘোষণা করে—যদি বাঘের দেখা পাই তবে এক কোপেই দু-টুকরো করে ফেলব।

শুনলাম, যাকে বাঘে নিয়েছে, সে নাকি তারই ছোট ভাই।

লোক দুটি আমাদের সঙ্গেই চলতে থাকে। আমরাও খুব সাবধানে এগিয়ে যাই, চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি তুলে ধরি। আমরা বাঘের চোখে পড়ার আগে সেই যেন প্রথম আমাদের নজরে আসে। হঠাৎ সামনে পড়লে যদি ঝাঁপিয়ে আসে, সেও ভাল, কিন্তু পেছনে এলেই সমূহ বিপদ।

সমতল ছেড়ে আমরা ক্রমে পাহাড়ে উঠতে থাকি···একেবারে ধার ঘেঁষে—নীচেই একটি উপত্যকা, তার মধ্যে ঝরনার ঝিরিঝিরি জল।

ওই কী একটা দেখা যায় না? যেন একটা মানুষ। ঝোপের ফাঁক দিয়ে কোমরের অংশটাই শুধু চোখে পড়ে। আমরা সবাই তটস্থ হয়ে রইলাম। বাঘটা নিশ্চয় এখানেই আছে। কিন্তু আধঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেল—কা কস্য পরিবেদনা।

অগত্যা আমরা নেমে সেই উপত্যকায় ঢুকে পড়ি। ছোট ছোট পাথরের নুড়ির ওপর রক্তের দাগ! মৃতদেহটাও ক্রমে নজরে এল। কিন্তু বাঘ কোথায়?

আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে নাগা দুজন বিকট উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিক্ষুব্ধ গর্জন—বিরাট লাফ দিয়ে ঝোপের ভেতর থেকে বাঘটা নিমেষের মধ্যে কোথায় যে মিলিয়ে গেল, এ তল্লাটে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

নাগা দুজন মৃতদেহটিকে পা-হিঁচড়ে টেনে আনে—সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। আমরা ক্যাম্পের দিকে রওনা দিলাম।

ফিরে এসেই দেখি, ওপরওয়ালার জরুরী চিঠি—আর দিন সাতেকের মধ্যেই এখান থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। হাতের কাছে এই যে বাঘটা মারণযজ্ঞ শুরু করেছে, তাকে খতম না করেই বা যাই কোথায়? রাতটা তো কোনোরকমে কেটে যাক, কাল দেখা যাবে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

রাত্রে সুনিদ্রা হল না। মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় শেষ। হঠাৎ আমাদের ক্যাম্পের পাশেই যে গোয়ালঘরটি, তার মধ্যে দুপদাপ আওয়াজ। জানালার পর্দা তুলে ধরি, বাইরে কৃষ্ণপক্ষের নিবিড় অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। তবু আন্দাজেই দু-দুটো গুলি ছুঁড়লাম। গুলির আওয়াজে ভল্টু ও দীক্ষিতের ঘুম ভেঙে গেল। ছুটে গোয়ালঘরে গেলাম। একটা বুড়ো ছাগল সেই ঘরের এক কোণে বাঁধা ছিল, সেটা নেই। ভিজে মাটির ওপর বাঘের নখের আঁচড় আর পায়ের ছাপ। আর সন্দেহ রইল না। এ সেই নরখাদক বাঘের কর্ম। মানুষ মেরেও তো খাওয়ার উপায় নেই—নাগারা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সমাধিস্থ করে। তাই খিদের চোটে অগত্যা ছাগলটাকেই উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।
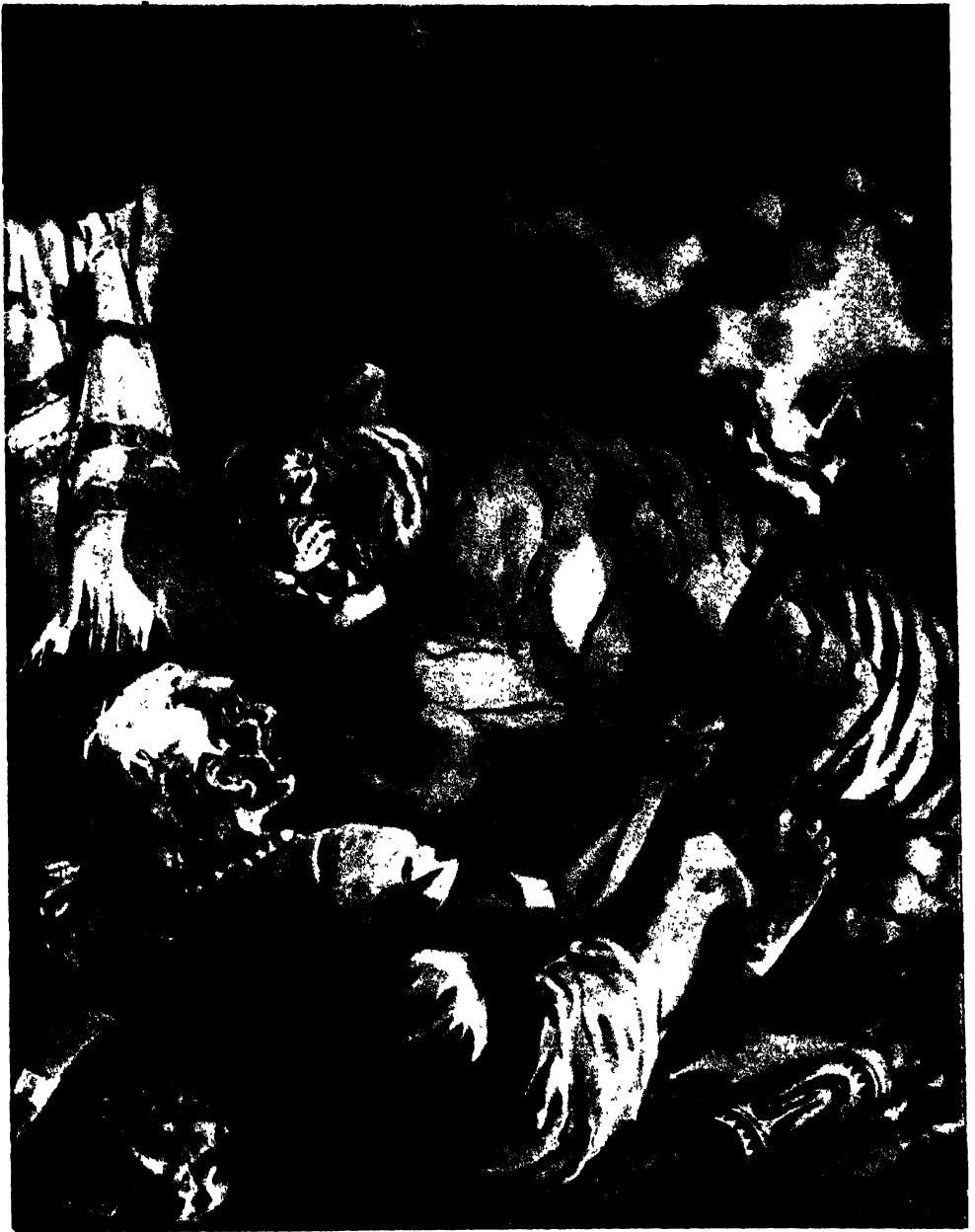
বুড়ো তখন আগুনের মধ্যে থেকে একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে······ [পৃঃ ১২

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেই ভল্টু এক বিরাট হল্লা লাগিয়ে দিলে। কাছাকাছি বস্তির নাগারা টাঙ্গি হাতে ছুটে আসে। আমরাও ভোরের কাজগুলো না সেরেই বেরিয়ে পড়ি। কাছাকাছি জঙ্গলেই হয়ত বাঘের সন্ধান মিলবে, তবু যেদিকে ছোটখাট নদীর খাত অথবা যেখানে জল জমা হয়ে আছে বা কোনও ঝরনার ধারেই হয়ত পাওয়া যাবে—এই আশা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই।

বাঘটার পেছনে ধাওয়া করতে আমরা মোটেই সময় নষ্ট করিনি। কাজেই আশা হল, হয়ত শিগগিরই মহাপ্রভুর সঙ্গে মোলাকাত হবে। প্রায় এক মাইল পথ চলে এসেছি। সামনে একটা বড় বাঁশের ঝোপ। নাগা পথপ্রদর্শকটিকে একটি গাছের মাথায় তুলে দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতেই প্রায় একশ গজ দূর থেকে বাঘের চাপা গর্জন শোনা গেল। সে জায়গাটা ঘন বাঁশের জঙ্গলে ঢাকা। বারো গজ এগিয়ে যেতেই আমরা সেই ছাগলটার অর্ধভুক্ত দেহটা দেখতে পেলাম। সেটাকে পেছনে রেখে বাঘের পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে যাই—যদিও তাকে পাওয়া দুরাশা। শিকারের কিয়দংশ ভক্ষণ করেই তারা জল খায়, তারপর দিবানিদ্রা। সূর্যাস্তের আগে সেই ফেলে-যাওয়া শিকারের কাছে ফিরে আসে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আমরা ব্যাপারটাকে যত সোজা ভেবেছিলাম, তা নয়। বাঘটা খুব চালাক-চতুর কিনা—টের পেয়ে গিয়েছিল, কেউ না কেউ দুশমন তার পেছনে লেগে আছে। তাই সেও আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় ছিল। কোন জায়গাতেই দু-তিন মিনিটের বেশী বিশ্রাম করেনি। একটা জায়গা সে সবে ছেড়ে গিয়েছে, এমনি প্রমাণও পেলাম কিন্তু বাঘের দেখা পাওয়া গেল না।

বেলা বেশ হয়েছে, ওপরে সূর্যদেবের প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টি চলেছে, আমাদের পেটের আগুনও দাউদাউ করে জ্বলছে। প্রায় মাইলখানেক চলার পর আমরা একটা ঘাসের জঙ্গলে এসে পড়ি। সেখান দিয়েই যে বাঘটা চলে গিয়েছে, তারও নিদর্শন পাওয়া গেল। বেলা প্রায় দুটো, এই সময়ই এঁরা সাধারণতঃ নিদ্রা দিয়ে থাকেন। কাজেই এটা আমাদের কাছে একটা সুবর্ণসুযোগ।

এদিকে আশঙ্কাও কম নেই। যদিই ওই বাঘটা আক্রমণের সুযোগ খোঁজে, তাহলে, যে কোনও মুহূর্তেই সে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কোনও শব্দ না করে

আমরা খুব সন্তর্পণে চলতে থাকি। দৃষ্টি সম্মুখে, বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল। পাশেই একটা ডোবার মত পেলাম। দেখা গেল, জল ঘোলা হয়ে উঠেছে—নরম মাটির ওপর পায়ের ছাপ!

তা হলে বাঘটা কাছাকাছি কোথাও আছে। এই মাত্র মহাপ্রভু এখানে স্নান করতে এসেছিলেন। এ অবস্থায় বিপদের ঝুঁকি কম নয়। কিন্তু সব বুঝেও তো উপায় নেই, আমাকে তখন বাঘের নেশায় পেয়েছে—একটা হেস্তনেস্ত না করে ফিরে যাব না।

পাশেই ঘাসের জঙ্গল—কী যেন একটা সাঁ করে চলে গেল। ঘাসের পাতাগুলো তখনও নড়ছে। আমরা চমকে উঠি, থমকে দাঁড়াই—কোথাও কিছু দেখতে পাই না। আবার চলতে থাকি। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই আগের জায়গাটিতে এসে পড়লাম। অর্ধভুক্ত ছাগলটা সেখানেই পড়ে রয়েছে।

কিছুতেই যখন বাগে পাওয়া যায় না, একটা কাজ করলে কেমন হয়? বাঘ হয়ত এক সময় এই ছাগলটার কাছে আসবে। কিছুটা তীব্র বিষ যদি ছাগলটার শরীরে ঢুকিয়ে দিই, তবে বাঘটা নির্ঘাত অক্কা পাবে।

প্লানটা খুলে বলতেই দীক্ষিতের চিন্তিত ভাব—এখানে বিষ পাবে কোথায়?

—ওসব আগেই চিন্তা করে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন করিয়ে ডিসপেনসারি থেকে কিছুটা স্ট্রিকনিন্ বিষ সঙ্গেও এনেছি।

সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাজ শুরু হয়ে গেল।

তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে ছাগলের দেহের খানিকটা চামড়া ছাড়িয়ে একটা গভীর ক্ষত করে নিলাম। তার মধ্যেই বিষ প্রয়োগ কর্মটি সুসম্পন্ন হল। তারপর চামড়া দিয়ে সে জায়গাটা বেমালুম ঢেকে দিতেই বাইরে থেকে আর কিছু বোঝা যায় না।

আমি একটা টিপ্পনী কাটি—ও তাহলে বিষ দিয়ে বাঘ মারলে? এ আর এমন কি বাহাদুরি?

অর্জুন সেনের চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

বাহাদুরি আছে বইকি! বুদ্ধিকে বনবাস দিয়ে এই জাতীয় বাঘশিকার হয় না। যেখানে যেরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, শিকারীরও সেই অনুযায়ী পথ বেছে নেওয়া উচিত। যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। এখন শোনো—এরপরই আমরা ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

সে রাতটাও কোনরকমে কেটে গেল। পরদিন খুব ভোরেই আমি রাইফেল

মরা বাঘের মাথাটা দুপায়ের থাবার ওপর লুটিয়ে পড়েছে—কিন্তু মৃত্যুর পরেও চোখ দুটি যেন জীবন্ত বিভীষিকা! [পৃঃ ১৩২

স্কন্ধে বেরিয়ে পড়ি। বুটের আওয়াজ শুনেই ফিরে দেখি ক্যাপ্টেন দীক্ষিত আর শ্রীমান ভল্টুও বন্দুক হস্তে আমার পশ্চাতে কুইক্ মার্চ করে আসছেন।

বেশ কিছুটা দূর থেকেই একটা বিকট গোঙানি শোনা গেল। যেন একসঙ্গে দু-কুড়ি বিড়াল ডাকতে শুরু করেছে। দীক্ষিত আর ভল্টুকে একটা গাছের ওপর উঠিয়ে আমি সেই বাঁশের ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়লাম—তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, উপত্যকার অপর পারে পাহাড়ের যে দিকটা উঁচু।

সামনেই যে দৃশ্য দেখলাম, তা চিরদিন মনে থাকবে। বাঘের এক একটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট গোঁগোঁ আওয়াজ আর ঘন ঘন উদ্বমন। বিষের পরিমাণ কম হয়ে গিয়েছিল বলেই অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করতে যা কিছু বিলম্ব।

তখনও প্রায় একশ গজ দূরে—একটু একটু করে অগ্রসর হই। হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। বাঘটা টের পেয়ে গেল নাকি? যাই হোক, আর অপেক্ষা নয়—

রাইফেলটা শক্ত করে ধরে আমি গুটিগুটি এগিয়ে যাই। আরও একটু সামনে যেতেই একটা খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। জানোয়ারটা মুখ তুলেই আমাকে দেখতে পায়। তারপরই যেন দারুণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও দেহটা ফুলিয়ে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে এগিয়ে আসে।

বাঁশের ঝোপের ভেতর দিয়ে আসার সময় দেহের ঘষা লেগে কঞ্চিগুলো মটমট করে ওঠে। প্রায় ত্রিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। তার পরিপূর্ণ দেহটা এবার দেখতে পেলাম। যেন জাগ্রত জিঘাংসা। কান দুটো পেছনে, সাদা দাঁতের ওপর কালো ঠোঁট-দুটো শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। ট্রিগারে আমার আঙুলের চাপ পড়তেই রাইফেল সেই বাঘের আজীবন শয়তানির সমুচিত প্রত্যুত্তর দিলে। একটা বিরাট হুমকি—তারপর সব ঠাণ্ডা।

মনে হল আমার লক্ষ্য বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল—বাঘটা স্থির হয়ে বসে এক দৃষ্টিতে আমাকেই লক্ষ্য করে আছে। আবার গুলি করি, তাতেও তেমনি অনড়-স্থির, ঠিক আগের মতই। মাথাটা ঝুলে দুপায়ের থাবার ওপর লুটিয়ে পড়েছে, লেজের দোলানি বন্ধ। ললাট ভেদ করে রক্তধারা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু, তার চোখ দুটি ?—ঠিক তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি গাঢ় কপিশ দৃষ্টি। মৃত্যুর পরেও যেন জীবন্ত বিভীষিকা !

পর পর দুটো আওয়াজ শুনেই পর পর দুটির আবির্ভাব। তারা আর কেউ নয়, আমাদের ভল্টু আর দীক্ষিত।

ভল্টুর চোখেমুখে বিস্ময়—এ ব্যাটা মরেছে কিনা—এখনও যে থাবা গেড়ে বসে ঠিক তেমনি তাকিয়ে আছে—আশ্চর্য !

আমাদের বীর বাহাদুর ভল্টু বন্দুকের নলটি বাঘের মুখের সামনে ঘুরিয়ে দিলেন আর চিৎকার করে বলতে থাকেন,—ব্যস্, খতম্ হো গিয়া !

এবার দীক্ষিতের অসীম সাহস। তার আকর্ণবিস্তৃত সুউচ্চ দন্ত পঙ্ক্তি বিস্ফারিত। ব্যাঘ্রসকাশে উপস্থিত হয়ে উপযুক্ত পরীক্ষার পর চিৎকার করে উঠল—এ ব্যাটা সেই বাঘ, যাকে বুড়োটা কোমরে টাঙ্গি মেরেছিল। এই তার দাগ, আর এই দেখ পিঠের রোঁয়া পুড়ে গিয়েছে, জ্বলন্ত চেলা কাঠের সেই বেদম প্রহার যাবে কোথায় ?

আর আমি কী বলেছিলাম জানো ? অ্যাদ্দিন পরে বিষবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ। বিষ দিয়ে যখন এই শয়তানটাকে শেষ করা গেল—এর নাম হোক বিষী।

———

ভণ্টুর সঙ্গে প্রথম মোলাকাত

জোড়া ভালুক শিকারের কাহিনী শেষ করেই অর্জুন সেন মন্তব্য করে—এ সবই প্রাক্‌-ভণ্টু যুগের ঘটনা।

প্রশ্ন করি—ওকে পেলে কোথায়? ডিটেকটিভ রবার্ট ব্লেকের সহকারী স্মিথের মত এমন করিতকর্মা অনুচর তো সচরাচর দেখা যায় না।

মেজর সেন তার গোঁফে হাত বুলিয়ে নেয়, তারপর আত্মপ্রসাদের সুর তার কণ্ঠে বেজে ওঠে—অনুগত কি এমনি হয়? করে নিতে জানা চাই। তবে হ্যাঁ, করিতকর্মা ও চিরদিনই। আমার কাছে আসার আগেকার যে কাহিনী আমি যোগাড় করেছি, তার মধ্যেও ওর সদাজাগ্রত কর্তব্যবুদ্ধি ও বেপরোয়া সাহসের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

—কোথায় প্রথম দেখা হল?

—ডুয়ার্সে। মিলিটারী ট্রেনিং শেষ হবার পর চালান হলাম ইস্টার্ন কমাণ্ডে,

পোস্টিং হল ভোটান ফ্রন্টিয়ারে। দালসিংপাড়ার কাছাকাছি সন্তল্লাবাড়িতে আমাদের ক্যাম্প।

বেশ আছি, খাই দাই ঘুরে বেড়াই। দালসিংপাড়ার হাট রবিবারেই বেশ জমে ওঠে। একবার গিয়েছি সেই হাটে—কিছু নেপালী, কিছু ভুটিয়া, হিন্দুস্থানী আর বাঙালী ব্যবসায়ীরা হাটে দোকান করে। মাঝে মাঝে লামাগোছের দু চারজন তিব্বতীও দেখা যায়। আমদানীর মধ্যে দেখলাম, মাখন. কমলালেবু, ডিম, মুরগি, আলু, কোয়াস আর গারো কচু। তেল লবণ মসলার দোকানও আছে। কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করে গ্রামের লোকেরা হাটে এনে বিক্রি করে। ঘুরতে ঘুরতে দেখি. একপাশে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। কৌতূহল আমারও কম নয়—সেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম।

ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার আর কিছুই নয়—মোরগের যুদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি মোরগ পাখা ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পায়ে দড়ি বেঁধে মোরগের মালিক দুজন দরের আদানপ্রদান চালাচ্ছিল—সমবেত দর্শকদের মধ্যেও কেউ বা বাজি রাখে।

বুঝে নিতে কষ্ট হল না, মোরগের ওপর বেটিং চলছে। মজা মন্দ নয়!

বেটিংএর কথা বাদ দিয়ে মোরগের কথায় আসা যাক! জাঁদরেল দুটো মোরগ—দুটোর মাথায় বড় বড় ঝুঁটি, বুকের ওপর খানিকটা জায়গা লাল, পালক নেই। একটা সাদা আর একটা মেটে লাল রঙের। দুটোরই পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে ছোট ধারালো ভোজালির মত ছুরি বাঁধা আছে। তাই দিয়েই যুদ্ধ হবে। নিয়মটা এই, যে মোরগ ছুরি দিয়ে প্রথম তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করবে, সেই জিতবে। লড়াইএর ওপর বাজি রাখা হয়—যার মোরগ জিতবে, বাজির টাকা ও ঘায়েল করা কুক্কুট তারই প্রাপ্য।

লড়াই দেখছিলাম। মোরগ দুটো লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে আর এ ওকে আঘাত করতে চায়। কখনও বা দুটো ছুরিতে ঘসা লেগে ক্যাঁচ্ করে আওয়াজ ওঠে। কখনও বা একটা মোরগ অপরটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠোকর মারে। শেষ পর্যন্ত লাল মোরগটাই সাদাটার ওপর ছুরি বসিয়ে দিলে।

একটা হইহই আওয়াজ উঠল—ভিড়ের মধ্য থেকে গুণ্ডা গোছের একটি লোক ছুটে এসে আহত মোরগটিকে বুকে তুলে নিয়েই সে কী কান্না !

পলকের মধ্যে যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল। যে লোকটি সাদা মোরগের মালিক বলে জাহির করেছিল, সে উধাও। বেগতিক বুঝে দর্শকের মধ্যে অনেকেই কেটে পড়ে। শুধু লাল মোরগের মালিকটি এসে বুঝতে চেষ্টা করে, ব্যাপারখানা কী !

কৌতূহল আমারও কম নয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। সেই গুণ্ডা গোছের মানুষটির চোখে আর জল নেই, তার বদলে ফুটে উঠেছে একটা মারাত্মক প্রতিজ্ঞা —চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। দাঁত কিড়মিড় করে সে যা বললে, তার অর্থ সেই মোরগ-চোরের রক্তে সে তর্পণ করবে।

লোকটি বাঙালী, কিন্তু এমন সুগঠিত দেহ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাকে ডাকতেই, আমার মিলিটারী পোশাক দেখে প্রথমটা সে বেশ হকচকিয়ে গেল ; তারপর সটান আমার সামনে এসেই লম্বা সেলাম।

বুঝলাম লোকটি কায়দাদুরস্ত। তাকে একপাশে ডেকে খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞেস করি। লোকটি জাতে কুর্মী, আদি বাড়ি ভাগলপুর—পূর্বপুরুষ রুজি-রোজগারের সন্ধানে বাঙলায় আসে, এখন তারা পুরোদস্তুর বাঙালী।

জিজ্ঞেস করি—তোর নাম কী রে ?

—ভল্টুরাম।

—কোথায় থাকিস ?

—কিচ্ছু ঠিক নেই, যেখানে রাত সেখানেই কাত। তবে আপাততঃ এক কমলালেবুর ব্যাপারীর সঙ্গে আছি। সেই খেতে পরতে দেয়।

—কী কাজ করিস ?

—এমন কিছুই নয়, কমলালেবুর দর নিয়ে ভুটিয়াদের সঙ্গে কাজিয়া হলে আমি সামনে দাঁড়াই। বাস্, কিস্সা খতম্।

—সাদা মুরগিটা কার ?

ভল্টু বুক ফুলিয়ে বলে—আমার নিজের—আবার কার !

তাকে উসকে দিই—মোরগটা হেরে গেল যে !

—বাচ্চা কিনা, ধাড়ী মোরগটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কেন ?

লোকটার ভাবভঙ্গী কথাবার্তায় তার ওপর আমার কীরকম আকর্ষণ হল। সরাসরি প্রস্তাব করি—আমার কাছে কাজ করবি ?

—কী কাজ ?

—সব কাজ—

—যুদ্ধ করতে হবে ?

—হবে বই কি ! আমি যখন যেখানে থাকব, তোকেও সঙ্গে থাকতে হবে। আমি যখন মিলিটারী, তুইও মিলিটারী হবি। শিকার করেছিস কখনো ?

অম্লান বদনে ভল্টু বলে যায়—ঢের ঢের শিকার করেছি। আমার ঠাকুরদার একটা গাদা বন্দুক আছে, সেটা এখন আমার দখলে।

—তা হলে ঠিক তো ? কত মাইনে চাস ?

ভল্টু দাঁত বের করে হাসে, তারপর একটু লজ্জার ভাব দেখিয়ে বলে—মাইনে আর কী চাইব ? এই খাওয়া-পরা—আমি আবার একটু বেশী খাই কিনা, তাই মাইনে যে যা দেয় আপত্তি করি না !

—বেশ, তবে চলে আয় আমার কাছে। তোর মনিবের কাছে বলতে হবে না ?

—কে মনিব ? ইঃ ভারীতো কমলালেবুর ব্যাপারী ! আপনার কাছে থাকতে পেলে আমি আর কিছু চাই না। তবে একবার গিয়ে আমার টিনের তোরঙ্গ আর বন্দুকটা নিয়ে আসতে হবে।

—তবে চল আমার সঙ্গে !

ক্যাম্পে আসার পথে তাকে একটু একটু করে তালিম দিতে থাকি। আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ—সব কিছুতেই তাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। আজ পর্যন্তও তাকে পুরোপুরি আয়ত্তে আনা যায়নি। মাঝে মাঝেই গোঁয়ারতুমি করে বসে। তবে হ্যাঁ, বিশ্বাসী খুব, আর আমাকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসে।

মেজর সেন ভল্টুর কথায় যেন পঞ্চমুখ। সেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলি—সে কথা একশোবার। তোমার কাছেই শুনেছি, শিকারে তার বিক্রমের

কথা। শেষ পর্যন্ত তোমাকে আগলে রাখার মধ্যে যদি কখনো অন্যায় সাহস দেখিয়ে থাকে, সেটা যে তোমাকে ভালবাসে বলেই করে, এটা সুনিশ্চিত। ভল্টু, তোমার প্রথম শিকারের কাহিনীটা আজ শুনতে চাই।

—সেই কথাই বলব—তার আগে সামান্য ভূমিকা।

ভল্টু আমার কাজে বহাল হয়ে গেল। বেশ দিব্বি কাজকর্ম করে, বিশেষ কিছু বলে দিতে হয় না, কিন্তু মাঝে মাঝেই দুতিন ঘণ্টার জন্যে সে যে কোথায় উধাও হয়ে যায়—অনেক জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাই না।

চিন্তার কথাই বটে! যে গুণ্ডাধরনের লোক! ঝোঁকের মাথায় তাকে পছন্দ করে ফেললাম, কিন্তু যদি কোনও বদমাইশের দলে থাকে কিংবা খুনে ডাকাত হয়—তাহলেই হয়েছে আর কি! কোন্ দিন কোন ফ্যাসাদে না পড়তে হয়!

আমার ক্যাম্পেই সহযোগী মিস্টার তলোয়ারকরকে একদিন কথাটা খুলে বলি। ভদ্রলোক মারাঠী ব্রাহ্মণ, মিলিটারিতে এসেও দৈনন্দিন পূজা-আহ্নিক ত্যাগ করেননি। সমস্ত শুনে তিনি ভার নিলেন, এ রহস্য উদ্ধার করবেন।

হপ্তাখানেকের মধ্যেই ভল্টুর গোপন আড্ডার খোঁজ পাওয়া গেল। সেটা আর কিছুই নয়, যাকে ইংরেজীতে বলে জিমন্যাসিয়াম, আমাদের ভাষায় ব্যায়ামাগার, সেই ধরনের একটি খুদে প্রতিষ্ঠান। আটদশজন পাহাড়ী, নেপালী আর হিন্দুস্থানী ছোকরাদের নিয়ে সেই আখড়া—ভল্টু তাদের মাস্টার। নিজের হাতে গড়া জিনিসের ওপর মানুষের যে মায়া থাকে, তারই টানে ভল্টু মাঝে মাঝে গরহাজির হয়।

তলোয়ারকর উপদেশ দেন—লোকটা বিশ্বাসী আর সরল-গোঁয়ার বটে, তবে শাগরেদরা ওকে ভালও বাসে খুব, ভক্তিও করে। ওকে যদি পোষ মানাতে পারো—কোনো দিন আফসোস করতে হবে না।

একদিন কথায় কথায় ভল্টুকে শিকারের বিষয়ে বলেছিলাম। সেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, খুব শিগগির খবর আনবে।

শীতকাল, বিকেল চারটে বাজতেই পাহাড় আর জঙ্গলের ছায়া নেমে আসে। অকালে অন্ধকার এসে আমাদের ক্যাম্পে বাসা বাঁধে। কাজেই আমরাও হাত-পা গুটিয়ে পেনসনভোগী বৃদ্ধের মত চুপ করে হয় বই পড়ি, নয় তো অফিসের চিঠিপত্রে

মন দিই। সাতটা বাজতেই নৈশভোজন শেষ—তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে রাতের প্রহর গোনা ছাড়া আর কাজ কিছু থাকে না। পাশের ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়তেই ভল্টুর নাসিকা গর্জন সেই যে শুরু হয়, একটানা ঘররঘরর সেই আওয়াজ থামে সেই ভোর রাত্রে।

সেদিনও বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। এলোমেলো আকাশপাতাল কত কী চিন্তা করি, শেষ খুঁজে পাই না। এদিকে হেড্ কোয়ার্টার থেকে চিঠি এসেছে—আমার মেয়াদ সেখানে আর দিন পনেরো। তার পরেই যেতে হবে আসামে। বাঙলাদেশের শেষ প্রান্তে থেকেও মনে হত বাঙলাতেই আছি—এবার দেশছাড়া হতে হবে! এই সব এলোমেলো চিন্তার মধ্যেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, হঠাৎ ক্যাম্পের মধ্যে কোনও প্রাণীর জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে সেই অন্ধকারের মধ্যেই একজোড়া জ্বলন্ত বিন্দু দেখতে পেলাম। চট্ করে বিছানার ওপর উঠে-বসার ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। বালিশের নীচে আমার রিভলভার আর টর্চটা থাকেই। এক হাতে রিভলভার ধরে, অপর হাতে টর্চটা জ্বেলে সেদিকে ফেলতেই দেখি, গায়ে ডোরাকাটা একটি প্রাণী বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে—যেন কিছু একটা মতলব আঁটছে।

গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার উপক্রম। টর্চটা নিবিয়ে, শোয়া অবস্থায়ই রিভলভার ছুঁড়ব কিনা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ ভল্টুর নাসিকাধ্বনি থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সেই জ্বলন্ত চোখের অধিকারী জানোয়ারটি ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে ক্যাম্পের বাইরে যাওয়ার সময় ভল্টুর খাটে এমন একটা ধাক্কা দিয়ে গেল যে বিছানা থেকে সে পড়ে যায় আর কি?

ভূমিকম্প, ভূমিকম্প—বলে এক চিৎকার দিয়ে ভল্টু লাফিয়ে ওঠে। তলোয়ারকরও তাঁর ক্যাম্প থেকে ছুটে আসেন। আমি ভল্টুকে আশ্বাস দিয়ে বলি ভূমিকম্প নয়, ব্যাঘ্রঝম্প—হৃৎকম্প থামাও। তোমার বরাত ভাল, তোমার শরীর থেকে বাঘ দু এক সের মাংস খাবলে নিয়ে যায়নি।

বাঘের নাম শুনেই ভল্টু তার গাদাবন্দুক হাতে তখনই ছুটে সেই অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে আর কি!

টর্চটা জ্বালতেই দেখি, গায়ে ডোরাকাটা একটি প্রাণী দাঁড়িয়ে—কিছু একটা মতলব আঁটছে। [পৃঃ ১৩৮

আমি আর তলোয়ারকর তাকে অনেক কষ্টে নিরস্ত করি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে—আলো দেখা দিতে বড় জোর আধঘণ্টা বাকী।

তখনই ক্যাম্পের মধ্যে আমাদের তিনজনের বৈঠক বসে গেল।

বাঘের দেখা যখন মিলেছে তখন একটু কষ্ট করে জঙ্গলে ঢুকলে মোলাকাত নিশ্চয় হবে।

ভল্টু তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলে—আলবত্, আমার শাগরেদদের খবর দিলে তারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আর দেরি নয়, কাল সকালেই এর ব্যবস্থা করা উচিত।

তলোয়ারকর বয়সেও বড়, বিচক্ষণও কম নন; তিনি প্রস্তাব করেন—ভন্টুর শাগরেদ তো বেশী নয়, আরও লোকজন চাই যে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ভন্টু বলে—তার জন্যে ভাবতে হবে না। কুলী লাইনে গিয়ে আমি আরও কিছু নেপালী যোগাড় করে আনবো।

আমাদের দিক থেকে আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ—ভন্টু একবার বাজারের দিকে গিয়েই মাঝপথ থেকে ফিরে এল, তার সঙ্গে একটা নেপালী।

ভয়ে বিবর্ণ লোকটির মুখে একটি কথা নেই, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে। ভন্টুই তার হয়ে জানালো—আজ ভোরেই তার গোয়ালঘরে একটা বাঘ ঢুকেছিল। বাছুরকে ঘায়েল করে গাইগরুটার ওপরেও হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু লোকজন উঠে পড়ায় জানোয়ারটা পালিয়েছে।

তাকে সাহস দিয়ে বলি—কিচ্ছু ভয় নেই, এই এখুনি আমরা যাচ্ছি। তোমার দুশমনকে খতম না করে ফিরব না।

ভন্টুকে তাড়া দিয়ে বলি—বাজার বন্ধ থাক। যাও, তোমার শাগরেদদের খবর দাও, আর অমনি কুলী লাইনেও লোক যোগাড় কর। ন'টার মধ্যেই বেরুতে হবে।

ভন্টুর উৎসাহ দেখে মনে হল, অনেকদিন পরে একটা কাজের মত কাজ সে পেয়েছে। সে ছুটে চলে গেল। নেপালীটা এক কোণে বসে বিড়বিড় করে কী সব বকতে থাকে।

মিস্টার তলোয়ারকর ছাড়া ক্যাম্পের আর কেউ আমাদের সঙ্গী হতে চাইল না। কে না কে একটা খবর এনেছে—আর তাই নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো কারো পোষাবে না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লোকজন সব হাজির। প্রত্যেকের হাতেই লাঠি, বল্লম, ছোরা, টাঙ্গি—যার যা কিছু অস্ত্র-সম্বল ছিল, তাই নিয়েই চলে এসেছে। কারও হাতে বা ক্যানেস্ত্রা টিন।

আমার কোমরে রিভলভার আর হাতে বন্দুক। ভন্টুও তার ঠাকুরদার আমলের গাদা বন্দুকটা সঙ্গে নিলে। গুলির পেটিটা তার কাছে দিইনি, নিজেই গলায়

ঝুলিয়ে নিয়েছি। তলোয়ারকর শিকারে যাওয়ার কথা শুনেই কখন যে নিজের ক্যাম্পে ঢুকে ধ্যান-ধারণায় মন দিয়েছিলেন, খেয়াল করিনি, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ আমারও মুখে কথা নেই।

তলোয়ারকরের প্রশস্ত ললাটে রক্তচন্দনের তিলক জ্বলজ্বল করছে। উন্নত নাসিকাটি যেন খাপখোলা বাঁকা তলোয়ার। পরনে খাকি প্যাণ্ট ও হাফ শার্ট—হাতে বন্দুক।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পাহাড় বেয়ে চলেছি।

প্রায় মাইলখানেক এই দলবল নিয়ে যখন আঁকাবাঁকা পথে নীচে নেমে যাই—মনে হল আমরা যেন খুব বড় একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারে চলেছি। সকলের আগে ভল্টু আর সেই নেপালী, তারপর আমি, পেছনে তলোয়ারকর। ভল্টুর শাগরেদরা সব একজোট হয়ে গল্পগুজব করতে থাকে—তার মধ্যে বেশির ভাগই কে কোথায় কোন্ বীরত্বের কাজ করেছে তারই ব্যাখ্যান। নেপালী কুলীর দল বীটারের কাজ করবে—তারা নিঃশব্দে আসতে থাকে।

আমরা একটা বস্তির কাছে আসতেই সংবাদদাতা সেই নেপালী তার কুঁড়ে ঘরটির কাছে আমাদের নিয়ে গেল। তার গোয়ালঘর বলে যা দেখালো, তাকে ঘর বলা চলে না। ওপরে খড়ের ছাউনি, নীচে চারদিকে বাঁশের বেড়া, তার মধ্যে যা ফাঁক—ভেতর দিয়ে হিংস্র জানোয়ারের অবাধ প্রবেশ।

গোয়ালঘরে ঢুকে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। বাছুরটা মরে গিয়েছে। গাইগরুটার কাঁধে একটা বড় গোছের থাপ্পড়ের দাগ—নখের আঁচড়ে বেশ খানিকটা মাংস উঠিয়ে নিয়েছে।

গরুর মালিক, সংবাদদাতা সেই গ্রাম্য লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠতেই ভল্টু তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। তারপর আমাকে বলে—চলুন, এই পায়ের ছাপ ধরে আমরা এগিয়ে যাই।

নরম মাটির ওপর বাঘের পায়ের ছাপ কিছুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল, কিন্তু তারপর যে কোন্ দিকে যাওয়া উচিত কিছুই ঠাহর করতে পারি না।

তলোয়ারকরের সুবিজ্ঞ মন্তব্য—বাঘটা ধারে কাছেই কোথাও আছে। মুখের গ্রাস ছেড়ে যে সে দূরে চলে যায়নি, এটা সুনিশ্চিত।

ভল্টুর শাগরেদরা অস্থির হয়ে ওঠে—তারা তখনই বিক্রম প্রকাশের সুযোগ চায়। তাদের বুঝিয়ে বলি—এখন নয় ভাই, কার্যকালে কার কতখানি হিম্মত, তা দেখিও। এখন চল, সবাই মিলে সামনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ি।

জঙ্গলে ঢুকে প্রথমে তেমন কিছু ঝোপঝাড় দেখা গেল না। সরু মোটা লম্বা লম্বা শাল গাছ, তারই ফাঁকে ফাঁকে লতাফুলের ঝোপ। এর মধ্যে বাঘমশাই যে কিছুতেই থাকতে পারে না, সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে আরও খানিকটা এগোতেই এক জায়গায় এসে থমকে গেলাম।

জায়গাটি বিচিত্র। দুধারে শালগাছগুলো সতর্ক প্রহরীর মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের কিছুটা অংশ ঘন ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা, সোজা ঢালু হয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। তার মধ্যে ঢুকে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ সেই জঙ্গল থেকে ওপরের দিকে বাঘটা যদি আচমকা ছুটে আসে, আমাদের পক্ষে সেই ঢালু জমিতে দাঁড়িয়ে এধারওধার এক পাও নড়বার উপায় থাকবে না।

ঠিক ঢালু হবার মুখেই কিছু ছাড়াছাড়ি কয়েকটা জংলী গাছ ডালপালা ছড়িয়ে যেন আমাদের আশ্রয় দেবার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। তলোয়ারকরকে একটা গাছে তুলে দেওয়া হল। ভল্টু আমার সঙ্গ ছাড়েনি, আর একটা গাছে আমার পেছনে উঠে শক্ত হয়ে বসে। তার শাগরেদদের দুজন অপর একটি গাছে উঠে পড়তেই, ভল্টুর নির্দেশে বাকী সবাই নেপালী কুলীদের নিয়ে জঙ্গলের একপাশ দিয়ে একটি বীট শুরু করে। উদ্দেশ্য এই, তাড়া খেয়ে যদি সেই নীচের জঙ্গল থেকে জানোয়ারটা ওপরে উঠে আসতে চায়, আমাদের নজরে তাকে পড়তেই হবে। আর ভল্টুর গাদা বন্দুকে না হোক, তলোয়ারকর কিংবা আমার ১৪ বোরের বন্দুকের হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

কিছুক্ষণ পরেই জঙ্গল খেদা শুরু হল। ক্যানেস্ত্রা টিন বাজিয়ে, কানে তালা-লাগানো চিৎকারে বীটারের দল এগিয়ে আসে—আমরাও যে যার জায়গায় চক্ষুকর্ণ সজাগ রেখে বসে থাকি।

হঠাৎ নীচে থেকে চিৎকার ভেসে এল—বাঘ, বাঘ, ওই বাঘ!

আমরা এদিকওদিক তাকাই, কিছুই দেখতে পাই না—হঠাৎ ভল্টুর কণ্ঠে একটা চাপা উত্তেজনা—ওই যে ব্যাটা—

বাঘটা ঠিক ওপরে উঠে আসার মুখেই আমার আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নি উদ্গিরণ করে।

—কই, কোথায় ?

ভণ্টু অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখায়—ওই যে বাঁদিকের বড় ঝোপের আড়ালে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের কাছ থেকে দুশো গজের ওপর দূরত্ব—কাজেই এত দূর-পাল্লায় আওয়াজ করার ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তাছাড়া, জানোয়ারের পেছনে গুলি করে লাভ নেই।

কিন্তু বাঘটা সম্ভবতঃ বীটারদের হই-হুল্লোড়ে বিরক্ত হয়েই তার নিভৃত নীড় থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে চায়, কারা তার বিশ্রামের ব্যাঘাত স্বষ্টি করেছে। তারপর হয়ত নিজেকে কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকোবার চেষ্টাতেই সেই জানোয়ারটা সেই ঢালু জমি বেয়ে ওপরে আসতে থাকে। ঠিক ওপরে উঠে আসার মুখেই আমার আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নি উদ্গিরণ করে।

একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। একবার ঘুরপাক খেয়েই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে পর মুহূর্তেই যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে থাকে। কিন্তু নীচে নামতেই সামনে সেই জন পঞ্চাশেক বীটার এমন একটা হুল্লোড় বাধিয়ে এগিয়ে এল যে, পথ না পেয়ে ব্যাঘ্র-মশাই ফিরে আবার আমাদের দিকেই ছুটে আসে। কিন্তু, হঠাৎ এ কী হল, বাঘটা গেল কোথায়?

ভণ্টুকে সে কথা বলতেই সে সাহস দেখিয়ে বলে,—একবার নেমে দেখব না কী?

—যাক, তার দরকার নেই, তুমি চুপটি করে বসে থাকো।

ভণ্টুর শাগরেদ দুজন কিছু দূরেই অপর একটি গাছে আশ্রয় নিয়েছিল, হঠাৎ তারা আওয়াজ দিলে—ওই যে বাঘ বাঘ! এই গাছের তলা দিয়ে ছুটে পালালো।

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। বুঝলাম, সেটা তলোয়ার-করের। জানোয়ারটা ছুটে আমাদের গাছের কাছাকাছি আসতেই আমার দ্বিতীয় গুলিতে বাঘ মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল—একটা গর্জন পর্যন্ত করেনি।

গাছের ডাল ধরে ঝুলে ভণ্টু মাটিতে লাফিয়ে পড়ে—তলোয়ারকরও ছুটে আসেন।

ভণ্টুর শাগরেদ দুজন গাছ থেকে নেমে লাঠি হাতে সদর্পে পা ফেলে—যেন 'বাঘ বাঘ' বলে চেঁচিয়ে ওঠাও কম বীরত্বের নয়।

ভণ্টু তার গাদা বন্দুকের ওপর হাত বুলিয়ে বলে—কেমন পয়লা নম্বর শিকার করিয়ে দিলাম, দেখলেন হুজুর? এবার আমাকে আর আমার শাগরেদদের একদিন ফিস্টি খাইয়ে দিন।

———

জানোয়ারটা ছুটে আমাদের গাছের কাছাকাছি আসতেই

থাবাড়ের জঙ্গল থেকে যে বাঘের বাচ্চাটা কম্বল চাপা দিয়ে ধরে এনেছিলাম, সেটা তখন একটু বড় হয়েছে। গলায় শিকল দিয়ে রোজই তাকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে ঘুরে বেড়াই। কোনদিন সদর রাস্তা দিয়ে বাজারের দিকে, কোনদিন বা নিরিবিলি পদ্মার ধারে।

সেদিন পদ্মার ধারেই গিয়েছিলাম। ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। গেটের সম্মুখেই নজরে এল বন্ধু অর্জুন সেন···পশ্চাতে ভল্টু, আমারই অপেক্ষায় পায়চারি করছে।

তাড়াতাড়ি পা চালাই। অর্জুন সেনও হাত তুলে এগিয়ে আসে, কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল, হঠাৎ আমার সঙ্গী জানোয়ারটির গলা দিয়ে ঘররঘরর আওয়াজ বের হতেই অর্জুন সেন থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—এ কী হে? কুকুর নয়? আমি তো মনে করেছিলাম তোমার টেরিয়ারটা!

সহাস্যে বন্ধুবরকে বলি—টেরিয়ার নয়, টেরিবল্—বাঘের বাচ্চা!

—সাবাস ! বাঘের বাচ্চাকে শিকল পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে বেশ একটা থ্রিল আছে। জানি তো, তুমি চিরদিনই রোমাণ্টিক ! কী করে যোগাড় করলে বল তো !

উত্তর দিলাম—যোগাড় করে নয় হে, স্বহস্তে ধৃতবান্। তারপর, কতক্ষণ আসা হয়েছে ? চা-টা দিয়েছে কি না ?

—তোমার এখানে এলে, ওসবের জন্যে কিছুমাত্র চিন্তা করতে হয় না। যা একখানা গেস্ট-হাউস—

তার উচ্ছ্বাসকে থামিয়ে দিলাম—চল, আমার ফরাশের ঘরে গিয়েই বসা যাক। তারপর, ছুটি ক'দিনের ? কিছুদিন থাকবে তো ?

—না ভাই, সে সৌভাগ্য নেই। আমার ব্যাটেলিয়ন নিয়ে এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম বহরমপুরে, রাত্রে হল্ট করার প্রোগ্রাম করা আছে। আর সবাই চলে গেল, আমি নেমে পড়লাম এখানে। কাল সকালের গাড়িতেই গিয়ে ওদের ধরতে হবে।

অভিমান দেখিয়ে বন্ধুবরকে অনুযোগ করি—এ রকম নিমেষের দেখা নাই বা দিতে ?

—সত্যি ভাই, এবার কিন্তু না এলেই ভাল হত। তোমার ওই বাঘের বাচ্চাটা দেখে আমার বড় আফসোস হল। আমিও একবার শিকারে গিয়ে, তিন তিনটে বাচ্চা পেয়েছিলাম, সেগুলো বেশ বড়ও হল, কিন্তু আমারই কোথাও স্থিতি নেই কিনা—ব্যাচেলারদের যা হয়ে থাকে—তাই একটা গেল মরে, বাকী দুটোকে বিক্রি করে দিলাম। অবশ্য দাম পেয়েছিলাম ভালই।

—গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন সেই শিকারের কাহিনীটা বল দেখি, একবার নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিই। বাঘিনীর পাল্লায় পড়লে কী যে নাজেহাল হতে হয় সেটা আমি বিলক্ষণ জানি।

অর্জুন সেন দম নিয়ে বলে—না না, তেমন কিছু হয়নি। তবে সেবার যে দৃশ্য দেখেছিলাম, তা যেমন ইন্টারেস্টিং তেমনি অদ্ভুত। আমার শিকারী জীবনে এমনটি আর কখনও হয়নি।

অর্জুন সেনকে অনুরোধ করি—বেশ ধীরে সুস্থে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে যাও—দার্জিলিঙ্ মেল চালিও না। খুঁটিনাটি বিবরণ না দিলে গল্প জমে না।

—এটা জল মেশানো দুধ নয় হে বন্ধু, একেবারে খাঁটি সত্য ঘটনা!

অর্জুন সেন বলতে থাকে ঃ

সেবারে নেপালের তরাই অঞ্চলে কিছুদিনের জন্যে আস্তানা নিয়েছিলাম। কেন, কী প্রয়োজনে, এসব জানতে চেয়ো না—ব্যাপারটা পলিটিক্যাল। ওখানকার বাসিন্দারা সবাই পার্বতীয়া নেপালী। ভারতের মাটিতে ঘর বেঁধেছে—পাহাড়ী বলেই তাদের সকলে জানে।

ছোট্ট গাঁ। অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। চাষবাস করে। কারও বা নিজেরই জমি আছে, কেউ বা পরের জমি ভাগে চাষ করে। তবে ধানের গোলা দেখলে মনে হয় যে কমবেশী সকলের অবস্থাই সচ্ছল। অনেকের বাড়িতেই হাল বলদ। গাই-গোরু ও মহিষের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। গ্রামের পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা শুকনো নদীর খাত—জল এতটুকু নেই। আমাদের ক্যাম্প পড়ল নদীর ধারেই। ওপারে ঘন জঙ্গল, নানা রকম ছোট বড় গাছ…নিবিড় অন্ধকার সেই বন। পাহাড়ীরা সেখানে কাঠ কাটতে যায়—কোমরে ভোজালি, হাতে টাঙ্গি। অবিশ্যি একলা কেউ যায় না, দলে দলে ভাগ হয়ে কাঠ কাটে—সেই কাঠই তাদের জ্বালানীর কাজ করে।

শোনা গেল, কিছুদিন আগে এক পাহাড়ী সেই জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিল ; দলছাড়া হওয়ায় আর ফিরে আসেনি। লোকের বিশ্বাস, সে বাঘের পেটে গিয়েছে। ভয়ে কেউ আর ওমুখো হয় না ; কাছাকাছি কোথাও শুকনো গাছ পেলে তাই কেটে আনে।

আমরা যখন সেখানে ক্যাম্প করি, আমাদের সঙ্গে যে দলটি সেখানে পৌঁছল, তাকে একটা সার্কাস পার্টি বললেও চলে। কী নেই? তাঁবু তিন-চারটে। দুটো হাতি, একটা ছোট মাদী, একটা দাঁতাল ; গোটা তিনেক ঘোড়া। তা ছাড়া পাহাড়ীদের উপঢৌকনস্বরূপ গোটাচারেক খাসি ও দু-তিন খাঁচা মুরগি একটা তাঁবুর মধ্যে হরদম হরেকরকম ঐকতানের সৃষ্টি করে। ক্যাম্পে আমরা জন পাঁচেক প্রাণী। আমি, ভল্টু, ওখানকার সার্কেল অফিসার, তাঁর পিওন এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাহের মিয়া—একাধারে সেই আমাদের বাবুর্চী, মশালচী, আর কী নয়?

মাঝে মাঝেই নদী পার হয়ে ক্রমশঃ উঁচু পাহাড়ী বস্তিগুলো পরিদর্শনে আমাদের দূরে যেতে হয়; আবার হয়ত এক নাগাড়ে তিন-চারদিন তাঁবুর বাইরে যাই না।

সপ্তাহে একটি মাত্র হাট রবিবারে বসে। যা কিছু প্রয়োজন, সাতদিনের মত যোগাড় করে রাখতে হয়। তরি-তরকারি, শাক-সবজী সবই স্থানীয়। মাছ মোটেই পাওয়া যায় না। খাসির মাংস, মুরগি আর ডিমের আমদানিটা প্রচুর। হাটও বসে নদীর ধারেই। ওপারের পাহাড়ী বস্তি থেকেও লোকজনের সমাগম হয়, এদিককার গৃহস্থরাও তাদের কেনাকাটা করে। আমাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়েই হাটে যাবার পথ।

ভল্টু গিয়েছে হাটে, আমি তাঁবুর মধ্যে বসে সার্কেল অফিসারের সঙ্গে কিছু হিসাবপত্র তৈরি করছি—ওপরওয়ালার কাছে পাঠাতে হবে। পাশ দিয়ে হেটো লোকজন হেঁটে যায়, তাদের কথার আওয়াজ কানে আসে। তাহের মিয়া ক্যাম্পের একপাশে একটা বড় পাথরের ওপর বসে রাত্রের বরাদ্দ একটি হৃষ্টপুষ্ট মুরগির সৎকার করছে। তার হাতে যে ছোরাখানা, তার জন্যে সে কম গর্বিত নয়। এই দিয়ে তার বাপজান নাকি গণ্ডাখানেক শের খতম করেছে। পাশাপাশি তিনটে গাছের সঙ্গে আমাদের পক্ষিরাজ ঘোড়া তিনটি বাঁধা। তার মধ্যে সার্কেল অফিসারের বাহনটি নেহাত নির্জীব। বহুকাল উপযুক্ত খাদ্য না পেলে যা হয় তাই হয়েছে; অর্থাৎ পাঁজরার হাড়গুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। ক্যাম্পের বাইরে হস্তীমিথুন একটা পাকুড়গাছের ডাল ভেঙে নির্বিবাদে চিবিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে কুলোর মত কানের ঝাপটায় মাছি তাড়ানোর পটপট শব্দ হচ্ছে। তাদের পায়ে জড়ানো ভারী লোহার শেকলগুলো মাঝে মাঝে ঝনঝন করে ওঠে আর হঠাৎ এক একটা চাপা গুরুগম্ভীর আওয়াজ যেন দূরাগত বাজ পড়ার শব্দের মত শোনা যায়। সব মিলিয়ে কেমন একটা একটানা ঝিমিয়ে পড়ার সুর!

হিসেবপত্র শেষ হল। দ্বিপ্রহরে চোখে একটুখানি ঢুল এসেছিল। সব নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। যেন অলক্ষ্যে কোন এক ব্যাণ্ডমাষ্টার তার লাঠি ঘুরিয়ে এই বহু-বিচিত্র ধ্বনির ঐকতানকে বিরামের সংকেত দিয়েছে।

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গেল। আমি সজাগ হয়ে উঠলাম। দূরে দেখা গেল তিন জন লোক পাগলের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের দিকেই ছুটে আসে। তাদের মধ্যে একটি

সংবাদবাহক সেই রাখাল দুটি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

আমাদের পিওন ও তার সঙ্গে দুজন রাখাল। মাথার চুল এলোমেলো, গায়ের জামাকাপড় আলুথালু, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে বুকের পাঁজরা হাপরের মত ওঠানামা করে—চোখে কেমন একটা ভয়বিহ্বল উত্তেজনা! দেখেই মনে হয়, তারা কোনও গুরুতর সংবাদ এনেছে।

ব্যাপার দেখে হাটের লোকও অনেক জমে গেল। আমরাও বেরিয়ে এলাম। ক্যাম্পেও সাড়া পড়ে যায়। হাতি দুটো গুরুগম্ভীর সুতীক্ষ্ণ বৃংহিতে জানিয়ে দিলে হুঁশিয়ার, সব হুঁশিয়ার। ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে শক্ত জমির ওপর খুরের আওয়াজ করতে থাকে। এমন কি খাঁচার মুরগিগুলো পর্যন্ত ঝটাপটি শুরু করে দিলে। অজ-সম্প্রদায়ের যে কটি অবশিষ্ট ছিল, তাদেরও তারস্বরে ম্যাম্যা আর্তনাদ!

ব্যাপার কী?

প্রথমটা কিছুই ভাল করে বোঝা গেল না, শুধু সমবেত কণ্ঠে একটি মাত্র আর্ত চিৎকার কানে এল—বাঘ, বাঘ, বাঁচাও, বাঁচাও—

যারা সংবাদ এনেছিল, সেই রাখাল দুটি হুমড়ি খেয়ে পড়লো, তারপর শ্বাস-

রুদ্ধ কণ্ঠে কোনোরকমে জানাল, একটা বাঘিনী নদীর ওপারে তাদের মোষের পালে পড়েছে—তার বাচ্চাগুলো সঙ্গেই আছে।

ভল্টু ইতিমধ্যে হাট করে ফিরে এল। কাঁধের বোঝাটা মাটিতে নামিয়েই সে বুঝতে চেষ্টা করে, ব্যাপারটা কী! তারপর কাউকে কিছু না বলে সটান চলে গেল হাতির মাহুতকে ডাকতে। ছোট মাদী হাতিটাই খুব চটপটে, তাই সেটার পিঠে হাওদা চড়াতে বলে সে ঢুকে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। আমার ক্যাম্প-খাটের নীচেই রাইফেল আর গুলির বেল্ট থাকে—সেগুলি হস্তগত করে সে যখন বেরিয়ে এল, দেখলাম, শিকারে যাত্রা করার জন্যে সে প্রস্তুত।

সার্কেল অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর ভল্টু সেই হাতির ওপর সওয়ার হলাম। রাখাল দুটিকে পথ দেখানোর জন্যে আগে আগে যেতে বলি। তারাও তখন স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে পেয়ে দলে কিছুটা ভারী হয়েছে। সবার আগে তাহের মিয়া—হাতের সেই বহু-ব্যাঘ্রনিধনকারী অস্ত্র তুলে শূন্যে নাচায় আর আস্ফালন করে—আজ বহুদিন পরে তার ভোজালিটা আবার শেরের খুনে উজু করবে।

বেশী দূর যেতে হল না। নদীর এপার থেকেই ওপারে একটা ধুলোর মেঘ দেখা গেল, আর অনেকগুলো খুরের সমবেত খটাখট আওয়াজ—শিঙে শিঙে ঘর্ষণ আর ফোঁসফোঁস শব্দ শোনা যায়।

ধুলোর মেঘটা কেটে যেতেই যে দৃশ্য দেখলাম তা জীবনে ভোলবার নয়। এমন উত্তেজনা বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখি, একপাল মহিষ অর্ধচন্দ্রাকারে শিঙ মেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে ছোট বাচ্চা মোষ আর কিছু গরুবাছুরও আশ্রয় নিয়েছে। অদূরে একা ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রী তাক করে বসে আছে—কখনও বা মাটির ওপর নখের আঁচড় কাটছে। ওদিকে মোষগুলো তাদের খুর ঠোকে, শিঙে শিঙে খটাখট আওয়াজ—চোখে যেন বিদ্যুতের ঝলক। মাঝে মাঝেই চমৎকার অর্ধচক্রব্যূহের রণকৌশল দেখিয়ে সেই ব্যাঘ্রীকে আক্রমণ করতে ছুটে যায়। ব্যাঘ্রীও ধূর্ত কম নয়, সেও পাশ কাটিয়ে সেই মহিষব্যূহের দুর্বল জায়গার সন্ধান করে। কখনও পিছিয়ে

আসে, কখনও মাটির সঙ্গে বুক লাগিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে যায়। হয়ত কখনো ঝাঁপ দেবার ভঙ্গী করে, কিন্তু সেও যে ভীষণ উত্তেজিত, তার মুখের ভঙ্গীতে সেটা সুস্পষ্ট। কান দুটো খাড়া, চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ, একটুখানি হাঁ-এর পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে দু-কশ বেয়ে ঝরে পড়ে—মূর্তিমতী হিংসার মত সেই ব্যাঘ্রী যেন জগতের যত ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রতিশোধ-স্পৃহার জ্বলন্ত নিদর্শন···

এই পর্যন্ত বলেই অর্জুন সেন থামে তারপর সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে—যাই বল না কেন ভাই, বাঘিনীটাকে দেখে ভারী সুন্দর বলে মনে হল। যেন পরিপূর্ণ আরণ্যশোভাকে সে সঙ্গে করে এনেছে। তখনকার মত যদিও তার দেহে একটা নির্জিত শক্তির চিহ্ন, কিন্তু ভঙ্গীটাই আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। আমি অবাক্ হয়ে এই দৃশ্যটি মনের পাতায় এঁকে নিচ্ছিলাম।

ভল্টু স্মরণ করিয়ে দেয়—বাঘটাকে খতম করুন হুজুর, আমাদের পাল্লার মধ্যেই আছে।

তাকে বলি—সেটা আমিও জানি। তবে কিনা, এটাকে এখনই মেরে ফেলব কিনা ঠিক করিনি। আজ বরং থাক। কাল এই জঙ্গলে খেদা করে যা হয় করা যাবে।

ভল্টুর মুখে চোখে অপ্রসন্ন ছবি—হাতে পেয়ে শিকার কেউ ছেড়ে দেয় নাকি?

তাকে আশ্বাস দিই—এ শিকারে আনন্দ নেই। চোরের মত আড়ালে থেকে বাঘের ন্যায় একটা সেরা জানোয়ার হত্যা করার মধ্যে আর যাই থাকুক, বীরত্বের লেশমাত্র নেই। বিশেষ যখন বাঘিনীটা এক প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত।

ভল্টু চুপ করে গেল।

হঠাৎ মাহুত চিৎকার করে ওঠে—আহা—হা—একটা বাঘের বাচ্চা রে—

এই না বলেই সে হাতির গলার দড়ি ধরে ঝুলে মাটিতে নেমে পড়ল, তারপর সেই বাচ্চাটাকে কোলে তুলেই জানিয়ে দেয়—মরে গেছে হুজুর! মোষগুলোর পায়ের ঘা খেয়েই বেচারীর দফা-রফা!

সার্কেল অফিসার ভদ্রলোকটি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। এবার মুখ খুললেন —আমার মনে হয়, আরও বাচ্চা আছে।

আমিও সায় দিয়ে বলি—নিশ্চয়, একসঙ্গে ওদের অনেকগুলো বাচ্চা হয়। সবগুলোই বাঘিনীর সঙ্গে থাকে।

মাহুতকে নির্দেশ দিলাম—হাতিটাকে নিয়ে ঝোপঝাড়গুলো খুঁজে দেখা যাক।

চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু হাতিটা আবার মায়ের জাত কিনা, স্নেহবৎসলা—কিছুতেই নড়তে চায় না, পাছে বাচ্চাগুলোকে পেয়ে আমরা তাদের সাবড়ে দিই।

মাথায় ডাঙ্গশ মারতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে চলতে হয়। সামনের লম্বা কাশ-ঝোপের মধ্যেই আমাদের প্রার্থিত জীবের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা নয়, তিন তিনটে—সব কটিই নর। দেখে মনে হয় ডোরাকাটা বিড়ালছানা—ঠিক বিড়ালের বাচ্চার মতই ফিঁচফিঁচ করে ওঠে।

মাহুতের কম্বলে বাচ্চা তিনটিকে জড়িয়ে নিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কাজেই আর কোনও গোলমাল না করে আস্তে আস্তে সরে পড়াই ভাল। ওদিকে দর্পিতা ব্যাঘ্রী তার আক্রমণ রচনা করুক ব্যূহবদ্ধ মহিষযূথের বিরুদ্ধে।

ক্যাম্পে ফিরে এসেই বাচ্চাগুলোর তদবির শুরু হয়। একটা খাঁচার মধ্যে তাদের রেখে দুধ খাওয়ানোটা নিজের তত্ত্বাবধানেই করতে হল। ভণ্টুও এসব কাজে খুব অগ্রণী। পাছে সার্কেল অফিসার ভাগ বসান, তাই সে নিজে থেকেই হিসেব করে—তিনটে বাচ্চাই আমরা নেব। একটা আমার কোলে, আর দুটো সাহেবের ডাইনে বাঁয়ে থাকবে। নইলে মানাবে কেন ?

তাকে বাহবা দিই—বেশ চুলচেরা হিসেব যে শুভংকরও হার মেনে যায়—কী বল ?

সমস্ত রাত বাঘিনীর ক্রুদ্ধ হুংকারে সমস্ত বনভূমি বিকম্পিত। আমাদের চোখেও ঘুম নেই।

আর একটা দিনের মামলা। আগামী কালই হয়ত তার নির্বাণ-প্রাপ্তিযোগ।

বাধা দিয়ে বলি ঃ

—বাচ্চাগুলোর কী করলে শেষ পর্যন্ত ?

—কেন ? সেগুলো গোকুলে বাড়তে থাকে। তবে তাদের জন্যে একটা ছাগল

পুষতে হল। কারণ বাচ্চাগুলোর জন্যে একটা ধাই-মা চাই তো! প্রথম প্রথম ছাগলটা ভয় পেত, পরে সেও বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠল আর শিঙ বাঁকিয়ে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে খেলা করত।

দু-মাসেই বাচ্চা তিনটি এমন তাগড়া হয়ে উঠল আর এমনি তাদের খিদে যে দিনে ছটা করে পাঁঠা তাদের জন্য বরাদ্দ।

দু-মাস বাদে যখন তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরি, সে এক দৃশ্য। সাহেবগঞ্জে ফেরি স্টীমারে পার হতে গিয়ে রাজ্যের লোক আমাকে প্রশ্ন করে—জ্যান্ত বাঘ কোথায় পেলাম, ওরা কামড়ায় কিনা—মানুষ খায় কিনা—এমনি সাত-সতেরো প্রশ্ন।

কলকাতায় আসার পর একদিন একটা বাচ্চা মরে গেল। অসুখ হওয়ায় তাকে মাংসের বদলে দুধ দেওয়া হয়েছিল—সেটাই নাকি তার মৃত্যুর কারণ। আর দুটো বাচ্চা খুব তেজী আর দেখতে খুব সুন্দর। এ দুটোকে নিউ মার্কেটে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে দিলাম। কেই বা দেখে আর কেই বা ওদের তত্ত্বাবধান করে! জানই তো আমি চিরদিনের যাযাবর। তখন যদি তোমার সঙ্গে দেখা হত, তা হলে আর এমন অমূল্য সম্পদ্ হাতছাড়া করতাম না।

এই বলেই অর্জুন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

অর্জুনকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্যে বলি—যাকগে বাঘের বাচ্চার কথা, সেই বাঘিনীর কী হল, সেটা বললে না?

—নিশ্চয়, বলব বইকি! সে এক বীভৎস কাণ্ড। কী যে হয়রানি আর বিপদ একের পর এক আমার জন্যে জমা ছিল!

তার কথায় সায় দিয়ে বলি—সে তো হবেই! বাচ্চাগুলোকে গায়েব করার ঠ্যালা সামলাতে হবে না?

অর্জুন বলে যায়—শুধু বাচ্চাদের টানেই বাঘিনীটা ঘোরাঘুরি করছিল, তাই তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের কোনও কষ্ট হয়নি, বরং তাকে ঘায়েল করতে গিয়ে আরও একটা ফাউ পেয়ে গেলাম।

আমার চোখের দৃষ্টি জোরালো হয়ে ওঠে—আরও একটা বাঘের বাচ্চা?

—না, বাচ্চা নয়, তার বাবা!

—বাবা কী জেঠা, তুমি কি তার কোষ্ঠীবিচার করেছ ?

অর্জুনের সাফ জবাব—সে গবেষণায় তোমার কোনও লাভ নেই। ঘটনাটা এখনই শুনতে চাও না মুলতুবী থাকবে ?

—সে কী কথা ভাই ? বাঘিনীকে হাতের কাছে পেয়েও শিকার করলে না—আবার এখন বলছ কিনা মুলতুবী থাক ? আমার কিন্তু 'নাউ অর নেভার' !

—বেশ, তবে শোনো !

উত্তেজনায় ভাল ঘুম হয়নি। তারপর হাতির পিঠে উঁচুনীচু জমির ওপর ছুটোছুটি করে গায়ে গতরে ব্যথাও হয়েছে। পরদিন বিছানা ছাড়তে একটু বেলাই হয়ে গিয়েছিল।

বাইরে এসে দেখি, আমার সদাপ্রস্তুত ভল্টু মহারাজ সব দিকেই তৈরী। হাতি দুটোকে খাইয়ে নেওয়া হয়েছে, মাহুতও বাদ যায়নি। আশপাশের জনা ত্রিশেক লোকও হাজির—তারাও লাঠিসোঁটা, ক্যানেস্ত্রা টিন নিয়ে প্রস্তুত। নিজেও সুসজ্জিত, শুধু আমিই বাকী। সার্কেল অফিসার সাহেব যাবেন কিনা জিজ্ঞেস করতেই ভল্টু টিপ্পনী কাটলে—তিনি তাঁবুতে নেই, জরুরী কাজ আছে বলে সদরে গিয়েছেন।

—বেশ করেছেন। কিন্তু, তাহের ? তারও কাজ পড়ে গেল নাকি ? সেও পালিয়েছে ?

তাহের হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলে,—আজ্ঞে না হুজুর, বান্দার হাতে এই পৈতৃক ভোজালি থাকতে, সে কোনও শেরকে ডরায় না।

—বেশ, আমাকে আধঘণ্টার সময় দাও, আমি একেবারে তৈরী হয়ে আসি।

চিরপ্রথানুযায়ী ভল্টু আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। পোশাক পরানো, চা খাবার দেওয়া সব কিছুই সে নির্ভুল ভাবে করে গেল।

আমরা হাতির পিঠে রওনা হলাম। সঙ্গে লোকজন। সেই জলহীন শীর্ণকায়া নদীর পারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। স্থানীয় লোকজনকে নিয়ে তাহের ওপারে গিয়ে জঙ্গল বীট করার বন্দোবস্ত করে। আমরা নদীর খাত পার হয়ে ওপারে গেলাম।

সামনে খানিকটা অনুর্বর এবড়োখেবড়ো জমি, তারপরই আসল জঙ্গল। তারই এক পাশ ঘিরে উলটো দিক থেকে খেদা আরম্ভ হল। হাতি দুটো চালিয়ে আমি ও ভল্টু জঙ্গলের মুখে এসে পড়লাম।

তখন বেলা দশটা। জঙ্গলের ভেতরটা আমাদের কারও ঠিক জানা ছিল না। তাই হঠাৎ ভেতরে ঢুকতে ভল্টু ইতস্ততঃ করে।

আমি তাকে চাঙ্গা করে তুলি—সে কী রে? এতদূর এসে কি ফিরে যাব? আর হলই বা অচেনা, তবু হাতে বন্দুক থাকতে ভাবনা কিসের? এদিককার জঙ্গল তো আর ডুয়ার্সের মত নয়! দেখ্ না, সামনেই খানিকটা শুকিয়ে যাওয়া জলার মত। আশপাশের ঝোপগুলোও তেমন বড় নয় যে বাঘ ওরই মধ্যে লুকিয়ে থাকবে।

আমার কথা শেষ হয়নি, এমন সময় আমার হাতিটা হঠাৎ শুঁড় তুলে গুরগুর আওয়াজ তুললে। আমিও বন্দুক নিয়ে তৈরী—ভল্টুও কাঁধের ওপর হাতিয়ার তোলে।

আচমকা দেখা গেল ভল্টুর হাতির বাঁ পাশ দিয়ে কী একটা জানোয়ার বিদ্যুতের মত সামনের ঝোপে ঢুকে পড়ল। বীটাররাও ততক্ষণে এসে পড়েছে। সেই হই-হুল্লোড়ের আওয়াজে সেই জানোয়ারটা যেই না বেরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই আমারও গুলি। ছিটকে পড়ে সেটা মাটির ওপর গড়াতে লাগল। আমার গুলিটা লেগেছিল কাঁধে—ভল্টুর গুলি তার কানের পাশ দিয়ে মাথার ভেতর চলে যেতেই সব ছটফটানি বন্ধ।

কাছে গিয়ে দেখি, একটা লোমওঠা বুড়ো বাঘ—বীভৎস মুখভঙ্গী—কানের পাশ দিয়ে রক্তের ফিন্‌কি!

বাঘটাকে বেঁধে অপর হাতিটার ওপর তোলা হতেই আবার আমরা এগিয়ে গেলাম।

সেই বাঘিনীটা কোথায়? তাকে না পেলে তো আজকের শিকারই বৃথা।

লোকজন তেমন বেশী না থাকায় জঙ্গলের একপাশ খেদা করা হয়েছিল। তবে কি তাড়া খেয়ে বাঘিনীটা অন্যদিকে গা ঢাকা দিয়েছে?

মনের ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড বিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—অসম্ভব! হতেই পারে না!

বুড়ো বাঘটা যখন এদিকেই আছে, সদ্য সন্তানহারা বাঘিনীটা এ তল্লাট ছেড়ে

যেতে পারে না। হয়ত কোন একটা ঝোপের মধ্যে বসে তার দুশমনদের আক্রমণ করার মতলবে আছে।

বীটারদের আদেশ দিলাম—আর চোট খেদা করে যাও। প্রত্যেক ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে দেখ।

নতুন করে খেদা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্গলের মধ্যে আবার সেই ক্ষুব্ধ গর্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতি দুটোও দাঁড়িয়ে যায়।

জঙ্গল তচনচ করে বীটাররা ক্যানেস্ত্রা টিন বাজিয়ে চলে। সেই হট্টগোলে আমাদেরই মাথা গরম হয়ে যায়, বাঘের মেজাজ আর কতক্ষণ ঠিক থাকবে! কাজেই নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা তার নিষ্ফল হয়ে গেল। ক্রুদ্ধ বিক্রমে 'রণং দেহি' মূর্তিতে সে ঝাঁপিয়ে বের হয়ে আসে একটা বেতের জঙ্গল থেকে—আমাদের কাছ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে।

সে জায়গাটা অনেকটা ফাঁকা ছিল বলেই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। জোরে হাতি চালাতে আদেশ দিলাম। তখনও প্রায় আশি গজ দূরে—কিন্তু সেই ধূর্ত জানোয়ার কোথায় যেন কর্পূরের মত উবে গেল।

এদিকওদিক লক্ষ্য করি, কোথাও দেখতে পাই না। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে 'বাঘ, ওই বাঘ' চিৎকার শুনে অনেকখানি আশা ফিরে পেলাম। যেদিক থেকে চিৎকারটা আসছিল, আমার হাতিটা সেদিকে দু-দশ পা এগিয়ে যেতেই চমৎকার দৃশ্য!

বেশ বড় একটি ডোরাকাটা জানোয়ার গুঁড়ি মেরে একটি ছোট ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দেবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু তার মেজাজটা যে রীতিমত খারাপ, মুখের বিকৃতি আর দাঁত বের করে ভ্রুকুটি করার মধ্যেই তা বেশ টের পাওয়া গেল।

ভল্টু হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে—ওই বাঘ, ওই বাঘ, গুলি করুন!

বলতে যতটা সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক কম সময় দিয়েছিল সেই জানোয়ার। পলকের মধ্যে সে ওই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়েই ঝাঁপিয়ে আসে—মরণ যুদ্ধে সে যেন শেষ আঘাত হানতে চায়।

আমিও আর কালবিলম্ব না করে এক সঙ্গে দুটো গুলিই ছেড়ে দিলাম।

আমার প্রথম গুলিটা লাগলো বাঘের পায়ে। আহত হয়ে সে মাটির ওপর ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে পড়তেই দ্বিতীয় গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়েই সে ঝাঁপিয়ে আসে—মরণযুদ্ধে শেষ আঘাত হানতে চায়। [পৃষ্ঠা ১৫৬

ভল্টুর বন্দুকটা হাতে তুলে নিতেই দেখি সেই জানোয়ার আহত হয়েও বীর বিক্রমে ছুটে আসে। তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে, মুখে বিকট ভঙ্গী—যেন মূর্তিমতী প্রতিহিংসা তার সর্বাঙ্গে। হঠাৎ আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই আমার তৃতীয় গুলি তার গলায় মোক্ষম আঘাত করলে; ছিটকে বাঘটা মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ল—তার পর সব ঠাণ্ডা!

ভল্টু উৎসাহের আতিশয্যে হাতির ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে চায়। তার হাত ধরে থামিয়ে দিই। ওদিকে তাহের মিয়া ছুটে এসে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়।

তারপর তার ভোজালিটা বাঘের রক্তে ভিজিয়ে নিয়ে পরম উল্লাসে প্রচার করে—বহুদিন পর তার পৈতৃক হাতিয়ার শেরের খুন পান করে ঠাণ্ডা হল।

———

অর্জুন সেনকে অনুরোধ করি—এবার একটু দূরের কথা বল। তোমার ওই ডুয়ার্স আর নাগা পাহাড়ের ঘটনাগুলো একঘেয়ে।

—কেন, নেপালের তরাই, মধ্য প্রদেশের মামুণ্ডি সেগুলোও কি তাই ?

—না না, সে কথা নয়। তবে তোমার এই সৈনিক জীবনে ভারতের সব জায়গাই তো ঘুরে বেরিয়েছ—একবার রাজস্থানের কথা কিছু বল দেখি। ওদিকটায় আমার কখনো যাওয়া হয়নি। অহিংসা পরমো ধর্মের দেশে তুমি হিংসা করতে গিয়েছিলে কিনা, জানতে চাই।

অর্জুন সেন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর চুরুটে অগ্নি-সংযোগ করে গলাটাকে তাতিয়ে নেয়।

—তোমার আদেশ শিরোধার্য। উনিশশো আটচল্লিশ সালের গোটা বছরটা কেটেছিল রাজপুতানায়। সবে কমিশন পেয়েছি, বয়সও কম ; তাই যেখানে যখনই ক্যাম্প পড়ে, আমার ঘোরাঘুরিটা সমানতালে চলতে থাকে। নবলব্ধ স্বাধীনতার হাওয়ায় তখন উড়ে বেড়াচ্ছি।

জাহাঙ্গীরপুর শহরে যখন আমাদের ছাউনি পড়ল—একমাসের ছুটি পেলাম।

দেশে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় জবর একটা খবর পেলাম। আমরা যেখানে ছাউনি করে আছি, তার কয়েক শো গজ ওপরেই অনুর্বর এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমি আর মাঝে মাঝেই পাহাড়ের টিলা। বেশির ভাগই ঝোপে ঢাকা অথবা লম্বা 'টাইগার' ঘাসের জঙ্গলে ডুবে আছে। এই জায়গাই নাকি বাঘের আস্তানা হওয়ার দাবি রাখে। ছোট ছোট পাহাড়ী নদী বা নালা থাকায় সেই ছায়ায় ঢাকা জঙ্গলে গ্রীষ্মকালে বাঘের সমাগম বেশী হয়।

গ্রামের নাম মাংগাও—এখান থেকেই শিকারীরা যাত্রা করে। শুধু যে ব্যাঘ্র-নিকেতন, তাই নয়—এখান থেকে আরও খানিকটা ওপরে, যেখানে কতকগুলি গুহা-গহ্বর আছে, সেগুলিতে নাকি ভল্লুকের রাজত্ব। আসল কথা, মহুয়া ফুলের লোভেই ভালুক সেই আস্তানা ছাড়তে চায় না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যখন চারদিকে 'লু' বইতে থাকে, সেই পাহাড়ী-জঙ্গলের এয়ার-কণ্ডিশন-করা জায়গায় ব্যাঘ্র ও ভল্লুক সম্প্রদায় যে বেশ সুখেই দিন কাটায়, তাতে আর সন্দেহ কি ?

কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন সুখ তাদের ভাগ্যে বড় একটা জোটে না। কারণ, হরদম শিকারীর আনাগোনা। ফলে, জানোয়ারগুলোও ক্রমে ধূর্ত হয়ে উঠেছে। মানুষের সাড়া পেলেই তারা কোথায় যে আত্মগোপন করে, তার হদিস পাওয়া সহজ নয়।

আমাদের মধ্যে কয়েকজনের শিকার-প্রীতির কথা চালু হয়ে গিয়েছিল। একদিন সকালে বিচিত্র বেশধারী এক গ্রাম্য সর্দার এসে হাজির।

তাকে তলব করতেই সে এসে আভূমি প্রণত। হাতের দেড় মানুষ লম্বা লাঠিটা এককোণে ঠেস দিয়ে রেখে সে যা বললে, তার মর্মার্থ এই—

সে একজন পাকা শিকারী এবং সাহেবদের শিকার করানোই তার পেশা। লোকজন যোগাড় করা, খেদা, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া, সবই তার এক্তিয়ারে!

দৈনিক পাঁচ টাকা তার নিজের মজুরী, বীটারদের মাথাপিছু এক টাকা এবং বাঘ বা ভালুক শিকার হলে, জানোয়ার পিছু পঁচিশ টাকা বখসিস।

এ তো বড় চমৎকার! মন্দ ব্যবসা নয়!

রাজী হওয়া ছাড়া উপায় কি? শ' খানেক টাকার ধাক্কা। পঁচিশ টাকা অগ্রিম নিয়ে লোকটা চলে গেল, বলে গেল পরদিন সকালেই সে খবর নিয়ে আসবে।

আমার সঙ্গে আরও দুজন ক্যাডেট ছিল—সীতাংশু ঘোষ আর মোহন সিং। তারাও সমান উৎসাহী। প্রত্যেকেই তেত্রিশ টাকা করে চাঁদা দিলাম। নিরানব্বই-এর ধাক্কা কাটিয়ে বাকী একটাকার জন্য লটারি করা হল—নাম উঠল আমার। কাজেই সেই এক টাকাও আমাকে গচ্চা দিতে হল।

পরদিন সকালেই সেই সর্দার এসে হাজির। নাম মানাভাই।

দেখা হতেই জানালো—ইচ্ছে হলে সাহেবরা সেদিনই শিকারে যেতে পারেন—নইলে পরদিন। বীটারের দল নিয়ে মানাভাই একদম রেডি।

সেদিন আর যাওয়া সম্ভব নয় বলে মানাভাইকে তার পরের দিন খুব ভোরে আসতে বলে দিলাম। সীতাংশু আর মোহন সিং তাদের বন্দুক, রাইফেল তেল দিয়ে পরিষ্কার করে রাখলে। আমার নিজস্ব চোদ্দ বোরের দোনলা বন্দুকটা এডিনবার্গের তৈরী, ভারী কাজের। সেটা ছাড়াও এক অফিসার বন্ধুর কাছ থেকে একটা দামী বন্দুক সংগ্রহ করা গেল।

পরদিন ভোরে উঠেই, আমি, সীতাংশু আর মোহন সিং পাশের ছোট্ট নদীতে স্নান করে নিলাম। তারপর পোশাক পরে ক্যাম্পের সামনে চায়ের টেবিলে বসে সেদিনকার শিকার সম্বন্ধেই জল্পনা-কল্পনা চলছে, এমন সময় একটি স্থানীয় লোককে সেদিকে ছুটে আসতে দেখা গেল। তার কণ্ঠে ভীতিবিহ্বল স্বর—বাঘ—বাঘ—বাঘ! আমার গরু নিয়েছে—মেরে ফেলেছে! অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে! হায়, হায়, কী করবো আমি!

আমাদের সামনে এসে লোকটা মাটির ওপর গড়াগড়ি দেয় আর কাতর মিনতি করে যাতে আমরা তখনি গিয়ে সেই বাঘটাকে মেরে ফেলি।

মোহন সিং লাফিয়ে ওঠে—টেণ্টের ভেতরে ঢুকে বন্দুক আনতে চায়। তাকে

আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাঁতরে নালাটা পার হতে চায়

পৃঃ ১৬৬

সামনে এসেই মানাভাই কুর্নিশ জানায়! [পৃঃ ...

থামিয়ে দিয়ে বলি—ব্যস্ত হয়ো না, মানাভাইকে আসতে দাও। বাঘ যখন মারি করেছে তখন এ তল্লাট ছেড়ে সে কোথাও যাবে না।

সীতাংশু তাড়া দেয়—চলই না, আমরা নিজেরাই এগিয়ে যাই। তোমার মানাভাই আসবে কি আসবে না, তার কি ঠিক? হয়তো আমাদের টাকাটাই মারা গেল।

তাকে বুঝিয়ে দিই—কক্ষনো না! এটা ওর ব্যবসা, নিশ্চয় আসবে। তবে বীটারদের যোগাড় করতে হবে তো, তাই হয়ত দেরি হচ্ছে।

আমার কথা শেষ না হতেই, কিছুটা দূরে দেখা গেল মানাভাইয়ের সুদীর্ঘ দেহ। তার চাইতেও তার বিরাট পাগড়িটাই সকলের আগে চোখে পড়ে। হাতে সেই লম্বা লাঠি, সঙ্গে জন দুই লোক।

সামনে এসেই সে কুর্নিশ জানায়।

বাঘের সংবাদ দিতেই সে সম্পূর্ণ সপ্রতিভ ভাবে বললে—আমিও বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছি। আর পথেই শুনলাম, বাঘটা মারি করেছে। বেশ বড় তাগড়া বাঘ—আপনাদের ভাগ্য ভাল।

ভাল কি মন্দ, কে জানে বাপু! এখন ভালয় ভালয় শিকার নিয়ে ফিরতে পারলে হয়।

মানাভাইকে প্রশ্ন করি—খেদার আয়োজন কদ্দূর?

—নিজের চোখেই দেখবেন, চলুন।

তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে আমরা তৈরী। পায়ে হেঁটেই যেতে হবে—হাতি, ঘোড়া কিছুই নেই। একমাত্র ভরসা মানাভাই।

তাকেই জিজ্ঞেস করি—কোন্ দিকে যেতে হবে? কত দূরে?

সর্দার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ওই যে দূরে একটা গ্রামের মত দেখা যায়, ওর পাশ দিয়েই যেতে হবে। প্রায় আড়াই মাইল পথ। হোথায় ভীলরা থাকে—পাশেই লোনী নদী, তার ওপারে জঙ্গল। নদীটা খুব ছোট, জলে হাঁটু ডোবে না।

পদব্রজেই রওনা হলাম। অসমান জমির ওপর দিয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে প্রায় একঘণ্টা পরে পৌঁছলাম সেই নদীর পাড়ে। সেটা পার হয়ে যেতে হবে।

মানাভাইয়ের নির্দেশে বীটাররা ওপারে জমায়েত হয়েছে। সর্দারজী প্রস্তাব করে—আগুনের খেলা দেখবেন ?

আগুন নিয়ে তো চিরদিনই খেলছি, আবার নূতন কী দেখাতে চায় ? তবু ভড়কে গেলাম—আগুন কেন ? বিশেষ এই দিনের বেলা, যখন রোদ ক্রমেই চড়া হয়ে উঠছে !

মানাভাই আশ্বাস দেয়—আগুন নয়, আতসবাজি। এতে বাঘটা তার আশ্রয় ছেড়ে নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়বে, তখন তাকে খেদা করে আমাদের কবলে নিয়ে আসা মোটেই মুশকিল হবে না।

পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে গেলাম।

ওপারে গিয়েই মানাভাই বীটারদের নির্দেশ দিলে—বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল বীট শুরু হবে—সঙ্গে থাকবে তার অভিনব প্রক্রিয়া। যখন একটার পর একটা বাজি পোড়ানো হবে, জঙ্গলের ভেতর বড় পটকা ফাটার আওয়াজ কম হবে না। তা ছাড়া আগুনের ঝলকানিতে এমন একটা চমক লাগানো পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গে বীটারদের হইহই আওয়াজ আর ক্যানেস্ত্রা টিনের বাজনা মিলে যেন সেই বনভূমিতে একটা প্রলয় বেধে যায়।

মানাভাই আমাদের সঙ্গে পরামর্শ চালায়—বাঘটা তার প্রথম আহার শেষ করে নিশ্চয় জল খেতে নালার ধারে গিয়েছে। গোলমাল শুনে হয় সে নালাটা পার হয়ে যাবে, নইলে কাছেই কোনও ঝোপে গা-ঢাকা দেবে।

আমার মুখে চিন্তার রেখা—তাই তো, যদি বাঘটা নালা পার হয়ে পালিয়ে যায় তো আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে।

মানাভাই তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়—সে গুড়ে বালি। বীটাররা এখনই নালার ওপার থেকেই খেদা শুরু করবে। কাজেই, আমরা যদি সামনে এগিয়ে যাই, ওদিক থেকে তাড়া খেয়ে মহাপ্রভুকে আমাদের সামনে পড়তেই হবে।

অদূরে একটা ঝোপের ভেতর কী যেন নড়ে উঠল ! মানাভাইয়ের সংকেতে আমরা সব দাঁড়িয়ে পড়ি।

মোহন সিং আর সীতাংশুকে মানাভাই কিছুটা ব্যবধানে দুটো গাছে উঠিয়ে

দিলে। আমরা দুজন রইলাম নীচে। সর্দারের হাতে সেই লাঠি আর আমার হাতে ১৪ বোরের রাইফেল।

পরিস্থিতি বিপজ্জনক সন্দেহ নেই। যদি বাঘটা তাড়া খেয়ে বেরিয়ে পড়ে, আমাদের দেখেই যে তার আক্রমণের প্রবৃত্তিটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে—এতে আর সন্দেহ কি? সে অবস্থায় এই রকম পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চলার ঝক্কিটা মারাত্মক। সেটা বুঝতে পেরেই মানাভাই আমাকেও একটা গাছে উঠতে অনুরোধ করে।

আমি সজোরে প্রতিবাদ করি—না, না, কিছু দরকার নেই। এগিয়ে চল, খেদা শুরু করা হোক।

বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করতেই নালার অপর প্রান্তে বিরাট হইচই শুরু হয়ে গেল—তার সঙ্গে আগুনের ঝলকানি আর দুমদাম পটকার আওয়াজ।

বাঘটা বোধহয় ভরপেট আহারের পর কোথাও নিদ্রা দিয়েছিল, হঠাৎ এই আওয়াজে আর আগুনের ঝলক দেখে তার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কী করবে ঠিক করতে না পেরে সে তার নির্ভর আশ্রয় ত্যাগ করে ছুটে আর একটা ঝোপে ঢুকে পড়ল।

মানাভাই উত্তেজিত হয়ে আমাকে বন্দুক তুলতে আদেশ করে। তার কণ্ঠে তখন বীর সেনাপতির গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

সেই আওয়াজকে ছাপিয়ে হঠাৎ আর একটি তীক্ষ্ণ গর্জন শুনলাম। তার মধ্যে বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা সুস্পষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গেই সেই বীর সেনাপতির মুখে আর কথা নেই।

কিছুকাল সব নিস্তব্ধ। বাঘের গর্জন শোনামাত্র নূতন জোগাড় করা ভাড়াটে বীটারের দল ছত্রভঙ্গ—যে যেখানে পারে গা-ঢাকা দেয়। মানাভাই মোহন সিং আর সীতাংশুকে ডেকে মাটিতে নামালে। তারপর আমাদের তিনজনকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বন্দুক নিয়ে তৈরি থাকতে বললে।

বীটারদের ডেকে সবাইকে একত্রিত করতে বেশ কিছু বেগ পেতে হল। তারাও শেষটায় একসঙ্গে লাঠি বল্লম হাতে দাঁড়ায়। কিন্তু ভয়ে একটি বীটার ছোট একটা গাছে

কোমরে গুলি লাগতেই বাঘটা একটা ডিগবাজি খেয়েই পেছনের পায়ে নৃত্য শুরু করে দেয়। [পৃঃ ১৬৬

উঠে পড়েছিল। দশ বারো হাত উঁচুতে একটা ডালের ওপর বসে সে সমানে কাঁপতে থাকে—কারণ, তার সামনের ঝোপটার মধ্যেই বাঘটা আত্মগোপন করেছে।

গোটাকয়েক মাটির ঢেলা সেই ঝোপের ওপর ছুঁড়ে মারতেই বাঘটা বেরিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যায়—ঠিক পাল্লার মধ্যে নেই বুঝেও আমি তৎক্ষণাৎ ট্রিগার টিপলাম, গুলিটা ব্যর্থ হল। বাঘ আর একটা ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করলে।

বীটারদের নিয়ে মানাভাই উলটো দিক থেকে আর একবার খেদা শুরু করে। আমরা তিনজনেই পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। হঠাৎ ঝোপের ভেতর থেকে বাঘটা বীর বিক্রমে বেরিয়ে আসতেই আমি গুলি করলাম। এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি। গুলিটা বাঘের কোমরে আঘাত করতেই জানোয়ারটা একটা ডিগবাজি খেয়েই পেছনের পায়ে নৃত্য শুরু করে দেয়। বন্দুকে আবার গুলি ভরে নিতে যেটুকু সময় লাগে তার চাইতেও কম সময়ের মধ্যে বাঘটা আবার ছুটে গেল সেই নালার দিকে—তারপর আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাঁতরে নালাটা পার হতে চায়।

মোহন সিং অপূর্ব নিশানায় গুঁলি ছুঁড়তেই বাঘের পিঠে সেই বুলেট বিদ্ধ হল। জানোয়ারটা সাঁতার কাটা ছেড়ে দিয়ে আবার আমাদের দিকেই ছুটে আসে।

আমরাও তখন যেন কী এক উন্মাদনায় অস্থির।

সর্দারজী নিষেধ করে—আর এগিয়ে যাবেন না!

মানাভাইয়ের মানা মানতে রাজী নই—এগিয়ে গেলাম।

বাঘটা নালার পাশ দিয়ে ওপরে উঠে আসবার মুখেই আমার বন্দুক পর পর দু-বার গর্জে উঠল। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বাঘটা শূন্যে লাফিয়ে উঠল বটে, কিন্তু মাটির ওপর পড়ে সে যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। হাত-পা এলিয়ে পড়া মাথাটা একপাশে কাত হয়ে আছে। শুধু দুটো জ্বলজ্বলে হলদে রঙের চোখে মৃত্যুর বিভীষিকা!

সেই পরম বীরপুঙ্গব মানাভাই তার মাথার বিরাট পাগড়িটা ভাল করে বসিয়ে নিয়ে দন্তরুচিকৌমুদী বিকশিত করে বলে—সাহেব, এমন জাঁদরেল বাঘ—বখসিসটাও জাঁদরেল হওয়া চাই!

খাসতালুকে ভালুক রাজা

পুরনো দিনের কথায় অর্জুন সেন উদ্বেল হয়ে ওঠে। প্রথম যৌবনের উন্মাদনা-ভরা মুহূর্তগুলি যেন তার মধ্যে নেচে ওঠে। সে তার ঝুলির ভেতর থেকে এক একটা কাহিনী বের করে আমার সামনে তুলে ধরে।

—এবার শোনো আবু পাহাড়ে ভালুক শিকারের কথা।

রাজপুতানায় সেবার বেশ কয়েকদিন শিকারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করেছিলাম। আমরা তিনজনই একই পথের পথিক। মোহন সিং আর সীতাংশু দুজনেই সমান উৎসাহী ; তবে দেশ-ভ্রমণটাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানাভাই আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। একদিন সেই প্রস্তাব করলে—চন্দ্রোতিতে প্রচুর ভালুকের আনাগোনা, সেখানে গেলে দু-একটা পাওয়া যাবেই।

আবু পাহাড়ের তলদেশে চন্দ্রোতি বা চন্দ্রাবতী একটি প্রাচীন স্থান। অতীতে ধন-জন-গৌরব যথেষ্টই ছিল, কিন্তু কালের কবলে এখন জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে। সাদা

মারবেল পাথরে তৈরী ভাঙা মন্দির বা প্রাসাদের জরাজীর্ণ রূপ মাঝে মাঝে সেই জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের কাছে প্রত্নতত্ত্বের চাইতে শিকারতত্ত্বের তাগিদটাই বড়, তাই সে জঙ্গলে কত পুরাকীর্তি লুকিয়ে আছে, সেটা খুঁজে বের করার ধৈর্য বা সময় ছিল না।

মানাভাই প্রাচীন কাহিনী শুনিয়ে যায়ঃ

—সুদূর অতীতে এই জায়গায় এক রাজার রাজধানী ছিল। তাদের সঙ্গে আশ-পাশের রাজপুত রাজাদের বড় একটা বনিবনা ছিল না। মুসলমানদের আমলে যখন সমস্ত রাজস্থানটাই মোগলদের এক্তিয়ারে চলে গিয়েছিল, তখনও এই রাজ্যের রাজা তাঁর আরণ্য স্বাধীনতা অটুট রেখেছিলেন। কিন্তু এক রাজকুমারীর খামখেয়ালিতে একদিন এই রাজ্যেও বিপদ ঘনিয়ে আসে, আর মোগলদের উপর্যুপরি আক্রমণে এই রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এখন সেটা ভালুকরাজের খাস দখলে।

সেখানকার শিকারের কথাটা তোমাদের বলা হয়নি। শোনোঃ

মানাভাই মাঝে মাঝেই খবর নেয়, ভালুকশিকারে যাওয়ার দেরি কত। আমরা তেমন গা করি না।

একদিন প্রত্যূষেই সে এসে হাজির। এবার আর একা নয়, সঙ্গে তার ছেলেকেও এনেছে। নাম মুন্নালাল, ছোট্ট মাথায় বিরাট এক পাগড়ি, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি, গলায় কালো সুতোয় ঝোলানো চাঁদির চৌকো ধুকধুকি। বয়স বছর কুড়ি—বাপের কাছে ব্যবসায়ে তালিম নিচ্ছে। লেখাপড়ায় অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী। গ্রামের পণ্ডিতের কাছে গালভরা শব্দ গুটিকয়েক কণ্ঠস্থ করে সুযোগ সুবিধামত চালিয়ে দেয়।

মানাভাই তার পরিচয় দিয়েই আদেশ করে—এই মুন্না, সাহেবদের কাছে তোর হিম্মতের কথা শুনিয়ে দে।

সেও তৎক্ষণাৎ হাতের লাঠিটা বগলদাবা করেই সেলাম ঠোকে, তারপর সুর চড়িয়ে বলে—সাহেব, আপনারা অনেক বাঘ মেরেছেন, কিন্তু ঋক্ষ মহারাজের কাছে যেতে হলে আমাদের সঙ্গে নেওয়া চাই।

সীতাংশু প্রশ্ন করে—ঋক্ষ মহারাজ? আরে ব্বাপ্ এটা আবার কোথায় শুনলি?

—কেন আমাদের মাস্টার সাহেবের কাছে। হালে শিখেছি কিনা—ঋক্ষ মহারাজ বৃক্ষে উঠিতে পারে।

মানাভাই তাকে ধমক দেয়—এই মুন্না, চুপ কর দেখি! তোকে আর পণ্ডিতি ফলাতে হবে না।

তাড়া খেয়ে মুন্নালাল চুপ করে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই তার হিম্মতের কথা শোনানো হয়নি বলে আবার শুরু করে—শুনুন, কি হয়েছিল। একবার এক ঋক্ষ, কী ভয়ংকর দেখতে, যেন একটা ভীষণ রাক্ষস—এই এত মহুয়া ফল খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে আছে। আমি ছাড়া কেউ দেখেনি। পিতাজীকে কিছুই বললাম না। চুপি চুপি কাকাজীর গাদা বন্দুকটা নিয়ে এসে ঋক্ষ মহারাজের মাথার ওপর নল বসিয়ে দড়াম্—বাস্ একাত-ওকাত—তারপরই কুপোকাত্—

সাবাস দিয়ে বলি—কেয়াবাত—একটা ঘুমন্ত ভালুককে মাথায় নল ঠেকিয়ে মারা কি সোজা ব্যাপার? এমন হিম্মতের কথা ভূভারতে কেউ শোনেনি। তারপর, তোমার ঋক্ষ মহারাজের কী হল?

—হবে আর কী? ঋক্ষ মহারাজ জীবনে আর কখনো বৃক্ষে উঠিতে পারিবেন না!

পিতৃদেবের আদেশানুযায়ী তার হিম্মতের কথা শোনাতে গিয়ে মুন্নালাল যতগুলি কথা বললে, মনে হল তার নতুন-শেখা ঋক্ষ কথাটি আট দশবার প্রয়োগ করতে পারায় তার চোখেমুখে আনন্দের ঢেউ!

মানাভাইকে জানিয়ে দিই—আজই শিকারে যেতে চাই।

সেও সর্বদাই প্রস্তুত।

আমরা প্রাতরাশ শেষ করে রওনা দিলাম। সপুত্র মানাভাই পথ দেখিয়ে চলে।

প্রায় মাইলটাক এগিয়ে যাবার পর সর্দারজী কিছুদূরে একটা ছোট্ট পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

ওটাই ভালুকের আস্তানা।

আমরা সেই পাহাড়ে উঠতে থাকি। ওপরে উঠে দেখি, যেন কোনও আকস্মিক ভূমিকম্পে পাহাড়ের চূড়াটা তছনছ হয়ে গিয়েছে। মস্ত বড় বড় ফাটল, এখানে সেখানে

পাথরের চাঁই স্তূপীকৃত হয়ে আছে—বুঝি কোন দৈত্য এক রাত্রির তাণ্ডব চালিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে।

মানাভাইকে জিজ্ঞেস করি—এ জায়গায় কি জানোয়ার থাকতে পারে? আমার তো মনে হয় তারা সব ভেগে পড়েছে।

সর্দারজী বলে ওঠে—সে কী সাহেব? আমি যে এক হপ্তা আগেও এ জায়গায় ভালুকের আনাগোনা দেখে গিয়েছি, আর সেই জন্যেই তো আগেই লোকজন পাঠিয়ে সব বন্দোবস্ত কায়েম! এই দেখুন, এখানে কতকগুলো পাথর একসঙ্গে পাশাপাশি রেখে আড়াল দেওয়া হয়েছে।

সীতাংশু আমার কাঁধে একটা চিমটি কাটে, তারপর দেখিয়ে দেয়—আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার থেকে আটশত হাত পেছনে ঠিক একটা নালার মত পাহাড়ের বুক চিরে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছে। মনে হয় সমস্ত পাহাড়টা জুড়েই তার আঁকাবাঁকা গতি।

মানাভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সে বলে—হাঁ সাহেব, ওই নালাটাই ভালুকের আস্তানায় যাবার পথ। ওর মধ্য দিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কারণ, যদি আশ-পাশের কোনও গহ্বর থেকে ভল্লুকপ্রবর বেরিয়ে আসে, তবে আর আত্মরক্ষার কোনও উপায় থাকবে না। তার চাইতে চলুন, আমরা ওর ওপর দিয়ে নালা বরাবর এগিয়ে যাই।

ছোটখাটো গহ্বর অনেক পাওয়া গেল, কিন্তু সেগুলি এত ছোট যে তার মধ্যে ভল্লুকের প্রবেশ সম্ভব নয়। খানিকটা যাওয়ার পর একটা বেশ বড় গোছের গুহা দেখতে পেলাম।

মানাভাই পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে ফুঁ দিতেই সঙ্গে সঙ্গে ওপর নীচে থেকে সাড়া পাওয়া যায়। বোঝা গেল, সর্দারজীর বন্দোবস্ত একেবারে পাকা। জানোয়ারের ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। যদিই কোথাও তার সাড়া পাওয়া যায়, আমাদের কাছে খবর পৌঁছতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হবে না।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে অনেকগুলি বড় বড় পাথরের চাঁই সাজিয়ে পথ বন্ধ করা হয়েছে। গহ্বরটা পাহাড়ের ভেতরে বহুদূর চলে গিয়েছে মনে হয়। এরই মধ্যে

ভল্লুকের আস্তানা, এ সম্বন্ধে আমাদের কারও কোন সন্দেহ রইল না। গুহার মুখে বাইরেও কিছুটা নিদর্শন পেলাম। টাটকা পায়ের ছাপ দেখে মুন্নালাল লাফিয়ে ওঠে—ঋক্ষ মহারাজ জরুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার বেরিয়ে আসার চিহ্ন পাওয়া গেল না।

সকাল থেকে যাদের পাহারায় রাখা হয়েছিল, তারাও বললে যে একটি প্রাণীকেও বাইরে আসতে বা ভেতরে ঢুকতে দেখেনি।

মানাভাইকে বলি—তাই তো, এখন কী করা যায়! এই গুহার মধ্যে তো আর ঢোকা যায় না। জানোয়ারটাকে বের করে আনার কী ব্যবস্থা হবে?

সর্দার যেন তৈরী হয়েই ছিল। হাতের সুদীর্ঘ লাঠিটা শূন্যে ঘুরিয়ে বললে—এখুনি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মুন্না, যা তো একটা লম্বা বাঁশ কেটে নিয়ে আয়।

ছেলেটিও যে করিতকর্মা, তার পরিচয় দিতে কসুর করে না। বাঁশ আনতেই তার মাথায় শুকনো লতাপাতা বেঁধে মশাল তৈরী করা হল। তারপর আগুন ধরিয়ে সেই গুহার মধ্যে অনেকটা ঢুকিয়ে দিলে—আর বাইরে থেকে তুমুল হই-হই রব।

কা কস্য পরিবেদনা!

কোন সাড়া-শব্দ নেই।

আমি প্রস্তাব করি—এতে হবে না। গুহার মুখে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন দেওয়া হোক, ধোঁয়ার চোটে বাছাধনকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

সে ব্যবস্থা হল, কিন্তু এত করেও কিছু ফল হল না।

এবার মানাভাই তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে। কয়েকটা বড় পটকা গুহার মুখে ছুঁড়ে মারতেই দুমদাম আওয়াজ—কিন্তু গুহার ভেতর থেকে কোন প্রতিবাদ নেই।

হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা যায়—ওই—ওই—ওই—ওই যে দেখা যায়!

মানাভাই গলা ফাটিয়ে জিজ্ঞেস করে—কোথায়? কোন্ দিকে?

আর কোনও সাড়া-শব্দ নেই।

মানাভাইয়ের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, মুখে বিরক্তির ছাপ!—এরা কোনো কাজের নয়! যত সব আনাড়ী অপোগণ্ডের দল!

সীতাংশু একটা যুক্তি দেখায়—হয়ত জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কিছু নড়ে উঠেছিল, তাকেই গাইডরা ভালুক বলে ধরে নিয়েছে।

মোহন সিং প্রতিবাদ করে—ধরে নেবে কেন ? ওরা যে দেখেছে বললে !

তাদের কথা কাটাকাটি এক কথায় থামিয়ে দিলাম—দেখাও বটে, খানিকটা ধরে নেওয়াও বটে !

মানাভাই তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়—তার মানে ?

—মানে কিছুই নেই। জঙ্গলের মধ্যে ভালুক হঠাৎ চোখে পডলেও, তাদের গায়ের রঙ জঙ্গলের সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ না দেখতে পেলে ঠিক ঠাওর করা যায় না।

মানাভাই সায় দেয়—সে কথা ঠিক, কিন্তু—

আর কিন্তুর প্রয়োজন হল না—হঠাৎ কী একটা চোখে পড়তেই সর্দারজী সচকিত হয়ে ওঠে। আমাদের তিনজনকে তিন জায়গায় প্রস্তুত হয়ে থাকার নির্দেশ দেয়।

যেখানটায় জঙ্গল একটু পাতলা হয়ে এসেছে, পাশ দিয়ে সরু একটা পথের মত দেখা যায়, তারই এক প্রান্তে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। ঠিক তার বিপরীত দিকে, যেখানে পাহাড়টা একটু ফাঁপা দেখায়, তার নীচেই মোহন সিং; সীতাংশুর স্থান হল একটা নালার ওপর ঝুঁকে পড়া ঝোপের আড়ালে।

মানাভাই তার ছেলেকেও একটা গাছের ওপর তুলে দেয়।

সে আপত্তি জানিয়েছিল—ঋক্ষ মহারাজ বৃক্ষে উঠতে পারে।

মানাভাই তাকে আশ্বাস দিয়ে ঠাণ্ডা করে। তারপর অভিজ্ঞ সেনাপতির মত সেই হালকা জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়ে আর সঙ্গে সঙ্গেই তার বীটারের দল জঙ্গল বীট্ শুরু করে দেয়।

হঠাৎ আবার একটা চিৎকার শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ। আর কোনও সন্দেহ নেই যে ভালুক বেরিয়েছে।

সীতাংশু যেখানে ছিল, তার পাশ দিয়েই নালার দিকে কী যেন একটা চলে গেল না ?

সে ছুটে এল আমার কাছে। খুব যে ভয় পেয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

ধাড়ী ভালুকটি সেই ধরাশায়ী জানোয়ারটার আপাদমস্তক শুঁকে দেখতে লাগল। [পৃঃ ১৭৫

মানাভাই হঠাৎ কয়েকটা হাউই জ্বেলে নালার দিকে ছুঁড়ে মারে। শুকনো পাতায় আগুন লেগে ধোঁয়ার চোটে সব অস্থির। একটু বাতাস উঠতেই আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে।

আর কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়!

মোহন সিং পাহাড় থেকে নেমে আসতেই সেই ভালুকটা তার চোখে পড়ে গেল। কিন্তু তখুনি তাকে গুলি করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারে না। জানোয়ারটা আমাদের কাছাকাছি একটা ঝোপের আড়ালে গদাইলশকরী চালে এগিয়ে চলছিল, তার পাশেই একটা বাচ্চা—বারেবারেই মায়ের পিঠে উঠতে চায়, কিন্তু মাটিতে পড়ে আবার ধাড়ী ভালুকটার পেছনে ছোটে। আমরা কিন্তু আড়ালে থাকায়, কিছুই বুঝতে পারিনি।

আমি আর সীতাংশু এটা ওটা আলাপ করি। এমন সময় হঠাৎ একটা মাঝারি গাছের ওপর থেকে মানাভাই চিৎকার করে বললে—হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!

চমকে উঠেই দেখি, আমরা দুজন যে পাতলা জঙ্গলের আড়ালে ছিলাম, তার পাশের পথ দিয়ে আমাদের প্রায় কুড়ি গজ দূরে একটা ধাড়ী আর একটা বাচ্চা ভালুক ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ করে চলেছে। ভাগ্যে আমাদের দেখতে পায়নি—নইলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

আর দেরি না করে ট্রিগার টিপলাম—বাচ্চাটা পেছনের পায়ে আঘাত খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। ধাড়ী ভালুকটাকে ইতিপূর্বে পরিষ্কার দেখা যায়নি। এবার দেখতে পেলাম। পাগলের মত ছুটে এসেই দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে বাচ্চাটাকে দুহাতে টেনে তুললো; তারপর সেটাকে তার পেটের সঙ্গে একহাতে জাপটে ধরে তিন পায়ে ভর করে চলতে থাকে।

আমার দ্বিতীয় গুলীটি লাগলো ভালুকের কোমরে। সঙ্গে সঙ্গেই সেই জানোয়ার বিকট আওয়াজ করে ধেয়ে আসে—তার দাঁতগুলো হাঁ-করা মুখের ভেতর ঝিকমিক করে ওঠে। গায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে। একটা থাবা উঁচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে যে ভাবে আসতে থাকে, মনে হল হাতের সামনে পেলে এক এক আঁচড়েই আমাদের এক এক জনের ভবলীলা সাঙ্গ করবে।

সীতাংশুর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিতেই সে পাশেই একটা টিলার ওপর উঠে গেল। আমিও আর কিছুমাত্র দেরি না করে গুলি করি। সেটা লাগলো তার ঘাড়ে। বাচ্চাটাকে মাটিতে ফেলে ভয়ংকর মুখভঙ্গী করে ভালুকটা এগিয়ে আসে।

প্রায় দশ গজ সামনে—এবার সেই উন্মত্ত ভালুক সোজাসুজি আমাকে দেখতে পায়। দু-দুটো গুলি খেয়েও ভালুকটা কাবু হয় না, বরং জবরদস্ত গুণ্ডার মত দুহাতের থাবা মেলে আমার ওপর হামলা চালায়।

আর মাত্র কয়েক হাত ব্যবধান। দেহের সমস্ত শক্তি ও গতি দিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বমুহূর্তে ভালুকটার মুখে বোধহয় একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠেছিল, কিন্তু আমার শেষ সম্বল সেই গুলি প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল তার বুকে। সাদা লোমের ওপরে ফিনকি দিয়ে নেমে আসে কৃষ্ণকায়া ভল্লুকীর গাঢ় রক্তের ধারা। একটা মরণ-আর্তনাদ করে সেই জানোয়ারটা ছিটকে পড়ে গেল। পেছনের পা দুটো শুধু নিস্ফল আক্রোশে মাটির ওপর ঘসতে থাকে—সামনের দুটো থাবায় উদ্যত হিংসা।

ভালুকটাকে খতম করার পর একটুখানি সময় পেয়ে, দুটো বন্দুকেই আবার গুলি ভরে নিয়েছি। সীতাংশুকে বলি—বাচ্চা ভালুকটা গেল কোথায় ?

যেখানে বাচ্চাটা রেখে ধাড়ী ভালুকটা আমাদের দিকে ছুটে এসেছিল, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই সীতাংশু যেন আঁতকে ওঠে—তার কণ্ঠে একটা বিহ্বল আর্তনাদ। সামনে ঝোপের আড়াল থাকায় আমি কিছু দেখতে পাইনি। সীতাংশুর চিৎকার